শিক্ষা ও সাহিত্য

Teachers' Journal
VOL. LXXXV NO.1 JANUARY, 2006



নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

শিক্ষা ও সাহিত্য

Teachers' Journal

মাঘ, ১৪১২

জানুয়ারী, ২০০৬

৮৫তম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা

চুয়ান্নর ঐতিহাসিক সংগ্রাম নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জীবনের এক চিরস্মরণীয় সন্ধিক্ষণ। ঐ সন্ধিক্ষণে সমিতির যে সংগ্রামমুখর গৌরবময় ভূমিকা তা ভারতের অপরাপর অংশেরও অনুপ্রেরণা হিসাবে এবং তার সংগ্রামী সচেতনতার জাগরণে উদ্দীপক ভূমিকা পালন করেছে। সমিতির জীবনে ঐ সংগ্রামমুখর দিনগুলির যে সুমহান ঐতিহ্য পরবর্তীকালে তা সমিতির চলার পথের ধ্রুবতারা হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। তার একান্ন বছর পরেও আজ সমিতির জীবনে ঐ শিখা দেদীপ্যমান। তার ঐতিহ্যই সমিতির অন্যতম পথনির্দেশক।

[৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় জননেতা জ্যোতি বসু কর্তৃক প্রকাশিত "চুয়ান্নর সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার" পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত]

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সমিতি কার্যালয় ঃ সত্যপ্রিয় ভবন, পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ ফোন ঃ ২২১৫-৭১৫৮
২২১৫-৮৮৫৬
ফ্যাক্স ঃ ২২১৫-৭৯৩২

সম্পাদক
শ্রীবিকাশ মণ্ডল

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীমতী অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী)

শিক্ষা ও সাহিত্য

সূচিপত্র

Teachers' Journal
CONTENTS

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল

সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়ন-বিরোধী মানুষ এক হও

গত ১৭-১৮ ডিসেম্বর'০৫ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হল STFI-এর তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনের মূল স্লোগান ছিল সাধারণের জন্য শিক্ষাকে আরো শক্তিশালী ও ব্যাপকতর করে তোলা এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম জোরদার করা। সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে — 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলা' ; 'ধর্মঘটের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী' ; 'বেসরকারী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বিল প্রত্যাহার' ; 'বেসকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রণে সংবিধান সংশোধন' ; 'বি জে পি-শাসিত রাজ্যগুলিতে শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরোধিতা' ; 'শোষিত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে সহযোগিতা' ; 'নতুন পেনশন স্কিম প্রত্যাহার' ; 'কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার দাবী' ; 'জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০০৫-এ শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ' ; 'শিশুশ্রমিক প্রথার অবলুপ্তি' ; 'কর্মসংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিকাশ' ইত্যাদি। সম্মেলনের এই সমস্ত স্লোগান ও প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করতে STFI-এর সমস্ত Unit-কে সচেষ্ট হতে হবে, কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। STFI-এর চিন্তাধারাকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে STFI-এর ভূমিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

চুয়ান্নর স্মরণীয় ঐতিহাসিক আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে সমিতির নতুন প্রজন্মের সৈনিকেরা পথ চলবে — এই শপথের মধ্যদিয়ে ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হলো ঐ আন্দোলনের বর্ষব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান। সূচনা হলো আর একটি নতুন বছরের। সমিতি তার চলার পথে ৮৫ বছরে পদার্পণ করল। সামনে কঠিন লড়াই। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী প্রভাবে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির শোচনীয় দুরবস্থা ঘটেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়ানক ক্ষতিকারক প্রভাব পড়েছে। সাধারণের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থা দিনে দিনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। এমতাবস্থায় নতুন বছরে অঙ্গীকার হবে — "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি......"। সাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করব। শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত হবে দেব না। শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি। শিক্ষাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

হরিয়ানার গুরগাঁওয়ের হন্ডা কারখানার শ্রমিকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের ন্যক্কারজনক ঘটনার পর আবার উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষণে ১২ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। গণতান্ত্রিক দেশের পুলিশ প্রশাসনের এ-হেন বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা দেশে ধিক্কার প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে হবে। এ ধরনের মধ্যযুগীয় বর্বরতা যাতে দেশের আর কোনো প্রান্তে না ঘটে সে ব্যাপারে গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষকে সজাগ থাকতে হবে। এই সমস্ত ঘটনার মূলে যারা আছে তাদের মুখোশ সবার কাছে খুলে দিতে হবে।

বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের রাজ্যের শান্তিপূর্ণ সুস্থির পরিস্থিতিকে অশান্ত ও হিংসাত্মক করে তুলতে চাইছে দুষ্কৃতিরা। তাদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমদের সোচ্চার হতে হবে, একে প্রতিহত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, এদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এর ক্ষতিপূরক প্রভাব যাতে না পড়ে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কোনোমতেই ৭০-এর দশকের নৈরাজ্যকে ফিরে আসতে দেব না — এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।

দেশের এইরকম কিছু নেতিবাচক ঘটনার বিপরীতে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি আমাদের কাছে আশার আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে। লাতিন আমেরিকার আকাশে বাতাসে এখন বিদ্রোহ আর লড়াই-এর ঢেউ। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, চিলির পর বলিভিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থী দল ও সংগঠনগুলির সমবেত প্রার্থী আদি ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ইভো মোরালেস সেদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। মার্কিন আধিপত্যবাদ, নয়া উদারনীতি, নির্বিচার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইভো মোরালেসের জয় পৃথিবীব্যাপী শোষণমুক্তির লড়াইয়ে মানুষকে প্রেরণা জোগাবে। আমেরিকা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সবরকম প্রচেষ্টাই শুরু করেছে। বলিভিয়ার নতুন সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে কিউবা ও ভেনেজুয়েলা। সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়ন-বিরোধী সমস্ত শক্তিকে বলিভিয়ার পাশে দাঁড়াতে হবে।

১৪.০১.২০০৬

সমিতির ডাক

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

পুরানো বছরের শেষ দিনটিতে সমিতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো। ৩১শে ডিসেম্বর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো চুয়ান্নর ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। চুয়ান্নর ঐ আন্দোলনে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির সমর্থনে যিনি বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে সোচ্চার হয়েছিলেন ও সেই অপরাধে যাঁকে তৎকালীন শিক্ষাবিরোধী সরকার কারাদণ্ড দিয়েছিল সেই শ্রদ্ধেয় জননেতা জ্যোতি বসু স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত থেকে ঐ আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করেছেন এবং রাজ্যের সাফল্যের নেপথ্যে যে শহিদদের ও গণআন্দোলনের একটা বড় ভূমিকা আছে তার উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, চুয়ান্নর আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের যে ত্রয়ী বিপদ আমাদের সামনে রয়েছে, যার ফলে সাধারণের বিদ্যালয়গুলি বিপন্ন, তার মোকাবিলা করবার জন্য বৃহত্তর গণআন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান এসেছে ঐ সভা থেকেই। গণআন্দোলনগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

ঐ সভা থেকেই আহ্বান এসেছে শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করবার জন্য। চুয়ান্নর আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই সমিতির নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছিলেন কর্মবিরতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি পূরণ করে দেবার। সেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে আমাদের। শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষা ক্রয় করতে যেন ছাত্রছাত্রীদের যেতে না হয় তার জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনের মান উন্নয়ন ঘটিয়ে।

শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণের জন্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার অভিনন্দনযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই শূন্যপদ পূরণ জরুরী এবং প্রয়োজনভিত্তিক। এই বছরই রাজ্যে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-মাদ্রাসা মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ২২ হাজার অতিরিক্ত শিক্ষাপদ তৈরি হয়েছে। এর কারণ ২০০৫ সালেই রাজ্যে ২০০০ জুনিয়র স্কুলকে হাই স্কুলে এবং ২৫৪টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা হয়েছে। কাজেই দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমেই এ কাজ সম্পন্ন হবে। এছাড়া রাজ্য সরকার ২০০৫ সালেই রাজ্যের বিদ্যালয় কাঠামোর উন্নয়নে মোট ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর মধ্যে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে আগেই। সম্প্রতি অর্থদপ্তর আরও ৬৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। এই টাকার মধ্যে চালু বিদ্যালয়গুলির গৃহনির্মাণে ব্যয় করা হবে ৫২ কোটি টাকা। এছাড়া ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ইত্যাদি নির্মাণেও টাকা ব্যয় হবে। আজ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলি উপচে পড়েছে ছাত্রছাত্রীতে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৪৯ শতাংশ ছাত্রী। শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়েছে অনেকটাই। সেক্ষেত্রেও সুষ্ঠুভাবে নিয়োগের জন্য আমাদের সার্বিক সহায়তা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতির মূলে রয়েছে শিক্ষক আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ঐতিহ্য হলো শিক্ষার দাবিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। শিক্ষাদরদী বামফ্রন্ট সরকার যে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তার সার্থক বাস্তবায়নে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে।

২০০৬-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২৪শে ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারে ছিল ৬লক্ষ, এবারে আরও প্রায় দুই লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী যুক্ত হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি আমাদের স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে দিতে পারে তার জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে।

বছরের শুরুতেই শুভ নববর্ষকে গ্রাস করেছে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের অশুভ প্রয়াস। এই সরকার খাদ্যে ৪ হাজার ৫২৪ কোটি টাকা ভরতুকি ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা কোটি কোটি মানুষ। বি পি এল এবং অন্ত্যোদয় যোজনায় খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রতি মাসে পরিবার পিছু ৫ কেজি করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই সঙ্গে এ পি এল তালিকাভুক্তদের ক্ষেত্রে রেশনে চাল ও গমের দাম বাড়ানোর পাশাপাশি মাস প্রতি পরিবারপিছু খাদ্যশস্য বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৫ কেজি। ইউ পি এ সরকারের সকল প্রকার গরিববিরোধী, জনবিরোধী সিদ্ধান্ত-এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশজোড়া প্রবল শৈত্যপ্রবাহে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে 'সমিতির ডাক' শেষ করছি।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ
শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ
১০.০১.২০০৬

আগামী ১লা মার্চ, ২০০৬ থেকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রাণপুরুষ সত্যপ্রিয় রায়ের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হবে। তাই 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র মার্চ সংখ্যার জন্য সত্যপ্রিয় রায় সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা, তাঁর কর্মজীবন, সাংগঠনিক জীবন এবং সংগঠনের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে লেখা পাঠান।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

স্বর্ণাক্ষরে লেখা চুয়ান্নর শিক্ষক আন্দোলনের কাহিনী

সুহাস চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের ১৮ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সামান্য কিছু বেতন বৃদ্ধির দাবিতে যে দীর্ঘ বারোদিনব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মঘট করেছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে তার সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠিত হবে আজ শনিবার (৩১শে ডিসেম্বর)। এই ধর্মঘট ছিল স্বাধীনোত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গের সামান্য বেতনে শিক্ষকতারত মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবি আদায়ের জন্য প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। ঐ সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রাজ্য সরকার যা ব্যয় করতো তা অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় ছিল কম। ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেট অনুযায়ী মহীশূরে রাজস্ব আয়ের ২২ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল শিক্ষাখাতে। বোম্বাইয়ে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২১ শতাংশ, মাদ্রাজে ১৭ শতাংশ, মধ্য প্রদেশে ১৭ শতাংশ, ইউপি-তে ১৬ শতাংশ, আসামে ১৬ শতাংশ, বিহারে ১৪ শতাংশ, পাঞ্জাবে ১৩ শতাংশ, ওড়িশায় ১৩ শতাংশ। আর পশ্চিমবঙ্গে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১১ শতাংশ।

পুলিস খাতে ব্যয়-বরাদ্দের সাথে শিক্ষার খাতে ব্যয়-বরাদ্দের তুলনা করলেই শিক্ষার প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতখানি অবহেলা করতো তা বোঝা যায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে পুলিসের জন্য যেখানে ব্যয় করা হয়েছিল জনসংখ্যার মাথাপিছু ২·৫ টাকা, শিক্ষার জন্য সেখানে ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ১·১৫ টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। আর পুলিস এবং প্রশাসনের জন্য অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।

শিক্ষক ধর্মঘটের আগে অমৃতবাজার পত্রিকায় (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪) প্রকাশিত মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য পরিচালিত একটি নমুনা সমীক্ষার প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী রাজ্যের কর্মরত বেতনভোগীদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষকদের মাসিক বেতন ছিল সবচেয়ে কম। এমনকি মজুরি শ্রমিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মাসিক আয়ের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষকদের ৮৩ শতাংশ ১০০ টাকার বেশি মাসিক বেতন পেতেন না। তাঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন ১০ বছরের বেশি এবং ২৫ শতাংশ শিক্ষকতা করেছেন ২৫ বছরের বেশি। ৫০ শতাংশ শিক্ষকের বেতন ছিল ৭০ টাকার নিচে। ৩৩ শতাংশ শিক্ষকের বেতন ছিল ৬০ টাকার কম এবং ১৪ শতাংশ শিক্ষক ৫০ টাকার কম বেতন পেতেন। স্বাভাবিকভাবেই ৮৬ শতাংশ শিক্ষকই ছিলেন ঋণগ্রস্ত।

এই সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন — নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এ বি টি এ)-এর পেছনে ছিল রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষকদের অবিসংবাদী সমর্থন। রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের কাছে একটি স্মারকলিপিতে এ বি টি এ দাবি জানায়, শিক্ষকরা যাতে দারিদ্র্য মুক্ত হয়ে শিক্ষকতার পবিত্র কর্তব্যে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন তার জন্য তাঁদের ন্যূনতম ২০০ টাকা বেতন দিতে হবে। অবশ্য এ বি টি এ ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন-এর সুপারিশ কার্যকর করার দাবি জানায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন-এর সুপারিশ ছিল ঃ যেসব শিক্ষক গ্রাজুয়েট নন, তাঁদের জন্য মূল বেতন নির্ধারিত হোক ৭০ টাকা, গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য ৮০ টাকা, ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য ১০০ টাকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এ/এম এস সি এবং এম এ বি টি শিক্ষকদের জন্য ১২৫ টাকা। রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য ডাঃ বি সি রায় মন্ত্রিসভা কর্তৃক বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন গঠিত হয়েছিল। এটি একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। বোর্ড যাঁদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন সরকারের সমর্থক। বিভিন্নস্তরের শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতনের হার নির্ধারণের জন্য বোর্ড যে সর্বসম্মত সুপারিশ করেছিল সরকার তা মেনে নিলে শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির সহায়ক হতো। কিন্তু ডাঃ বি সি রায়ের সরকার বোর্ডের কোনো সুপারিশই মানতে রাজি হয়নি। ফলে শিক্ষকরা ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হন।

এই সময়ে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে যে মহার্ঘভাতা

দেওয়া হতো তার পরিমাণ ছিল খুবই কম। স্বাধীনতার আগে লিগ মন্ত্রিসভার আমলে, হাইস্কুলের শিক্ষকদের ৫ টাকা হারে মহার্ঘভাতা দেওয়া হতো। ১৯৪৮ সাল থেকে এ বি টি এ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল। দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি উপেক্ষা করার পর ডাঃ বি সি রায়ের সরকার শর্তসাপেক্ষে ৫ টাকা হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে। শর্তটি হলো, স্কুলগুলি যদি সমপরিমাণ টাকা মহার্ঘভাতা হিসাবে দেয়, তবেই সরকারী ঘোষণা কার্যকর করা হবে। কিন্তু ৫০ শতাংশের বেশি স্কুলের পক্ষে শর্তটি মেনে নেওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাই সরকার ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শর্তটি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের জন্য সরকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের সমতুল্য মহার্ঘভাতা অর্থাৎ মূল বেতনের ওপর শতকরা ১৭·৫০ টাকা হারে ন্যূনতম ৩৫ টাকা দেওয়ার সুপারিশ করে। সমসাময়িককালে আজমীর, দিল্লি, পাঞ্জাব এবং বোম্বাইয়ে শিক্ষকদের এই হারেই মহার্ঘভাতা দেওয়া হতো। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে মহার্ঘভাতা সম্পর্কে বোর্ড কোনো অন্যায্য সুপারিশ করেনি।

চুঁচুড়া সম্মেলনে দাবির সমর্থনে এ বি টি এ ১১ হাজার শিক্ষকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। শিক্ষকদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল রাজ্যের সাধারণ মানুষের। সংবাদপত্রগুলির একটা বড় অংশও এই দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

শিক্ষক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকার ১৭·৫০ টাকা হারে মহার্ঘভাতা দিতে প্রস্তুত যদি বিদ্যালয়গুলি সমপরিমাণ টাকা মহার্ঘভাতা হিসাবে শিক্ষকদের দেয়। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ভালো করেই জানতেন যে এই শর্ত পালন করা ছিল বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাসত্ত্বেও তিনি শিক্ষকদের সাথে দর কষাকষি শুরু করেন। কিন্তু শিক্ষকদের ১০ই ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো গেল না। এর পরে মুখ্যমন্ত্রী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এবং ৬ই ফেব্রুয়ারি আরও দু'দফায় ছোটখাটো কিছু সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু তা ছিল শিক্ষকদের ন্যূনতম দাবি, বিশেষত ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতার তুলনায় অনেক কম। ইতোমধ্যে শিক্ষকদের আন্দোলনে ভাঙন ধরানোর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী কিছু সংখ্যক প্রধান শিক্ষককে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ডাকেন। কিন্তু এই প্রধান শিক্ষকদের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার জন্য এ বি টি এ কোন অধিকার দেয়নি। সাধারণ শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব করারও কোনো অধিকার তাঁদের ছিল না। তাঁদের সাথে আলোচনা করার পর মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচার করেন যে প্রধান শিক্ষকরা সাধারণ শিক্ষকদের তুলনায় বেশি যুক্তিসঙ্গত অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

ধর্মঘটের প্রাক্কালে শিক্ষকদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, "মনে হচ্ছে, যে ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া হয়েছে, তার উদ্যোগ শিক্ষকদের হাত থেকে রাজনৈতিক সংগঠনগুলির হাতে চলে গেছে"। এই বিবৃতি দেওয়ার পেছনে মুখ্যমন্ত্রী যে হিসাব করেছিলেন তা খুবই স্পষ্ট। শিক্ষকরা এইরকম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে একেবারে নতুন। যদি প্রমাণ করা যায় যে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে আসার পরিণতির কথা ভেবে ভীত হয়ে উঠবেন।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি শিক্ষকদের ধর্মঘটের পথ থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হয়। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মঘটে শামিল হন। ১০ই ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট শুরু হয়। শিক্ষকদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার সমস্ত প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়। বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের সামনে একজন বয়স্ক শিক্ষক আক্রান্ত হন। উইমেন্স কলেজের সামনে ৬জন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৩টি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেয়।

১১ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রীদের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ধর্মঘটী শিক্ষকরা মিছিল করে মহাকরণের দিকে অগ্রসর হন। রাজভবনের কাছে পুলিস তাঁদের বাধা দেয়। তাঁরা পুলিসের বেষ্টনী ভাঙার কোনোরকম চেষ্টা না করে সেখানেই অবস্থান শুরু করেন। এ বি টি এ-র সাধারণ সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় অবস্থানরত শিক্ষকদের সামনে ঘোষণা করেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার অবস্থান চলতে থাকবে। এই অবস্থান ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ রাজভবনের সামনে এসে অবস্থানরত শিক্ষকদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতে থাকেন। তাঁরা অবস্থানরত শিক্ষকদের জন্য অর্থ এবং খাবারের ব্যবস্থা করেন। অবস্থানস্থলে জমায়েত থেকে একদিন ৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। খিদিরপুরের হাইড রোডের কারখানাগুলির শ্রমিকরা তাঁদের একদিনের টিফিনের টাকা শিক্ষকদের সংগ্রাম তহবিলে দান করার সিদ্ধান্ত

করেন। ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল ফার্মগুলির কর্মচারীরা তাঁদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে এই তহবিলে প্রদান করেন। হোটেল কর্মচারীরা নিয়ে আসেন খাবারের প্যাকেট। ফলের ভেন্ডাররা দিয়ে যান ঝাঁকা বোঝাই কমলালেবু। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে মহিলাদের দীর্ঘ মিছিল এসে সংহতি জ্ঞাপন করে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সভা থেকে ৫ হাজার মানুষ মিছিল করে আসেন শিক্ষকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানোর জন্য। গণনাট্য সঙ্ঘের বিভিন্ন ইউনিটের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা স্কেচ করতেন আন্দোলনের স্মরণীয় দৃশ্যগুলির। এইভাবে লাগাতার অবস্থান চলতে থাকে।

শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে ১২ই ফেব্রুয়ারি সারা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। কলকাতার স্কুল-কলেজের ছাত্ররা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেন। শিক্ষক ধর্মঘটের ৫ম দিনে — ১৪ই ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের বেতন ও মহার্ঘভাতা এবং সরকারী সাহায্য পায় ও সাহায্য পায় না এমন সমস্ত স্কুলে শৃঙ্খলা ও দক্ষতা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতি এবং দুইজন শিক্ষাবিদকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। শিক্ষকরা এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কমিশন গঠনের পেছনে সরকারের যে দুরভিসন্ধি ছিল এ বি টি এ-র সাধারণ সম্পাদক তা ফাঁস করে দেন। তিনি বলেন যে, সরকার শিক্ষকদের বেতন এবং মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে চাপা দেওয়ার জন্যই এই ঘোষণা করেছে। কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে যে তদন্তের অংশ রাখা হয়েছে তা বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনকে দিয়ে অনায়াসেই করা সম্ভব। বস্তুত এই ধরনের কাজ করার জন্যও বোর্ড গঠিত হয়েছিল। তাছাড়া ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় সাংবাদিকদের ওপর পুলিসী নির্যাতনের তদন্ত করার জন্য গঠিত কমিশনের রায়ে যেভাবে সাংবাদিকদের ওপর একতরফা দোষারোপ করে সংশ্লিষ্ট পুলিস অফিসার এবং তার পুলিস বাহিনীকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল তাতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ সরকার গঠিত কোন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। তাই শিক্ষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন গঠনের পেছনে সরকারের সদিচ্ছা রয়েছে একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি।

শিক্ষকদের অভূতপূর্ব ধর্মঘট এবং সফল অবস্থান আন্দোলন যেভাবে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল তাতে সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষকদের এবং সাধারণ মানুষকে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন কোনোভাবেই প্রতারিত করা সম্ভব হলো না, তখন সরকার একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ১৪ই ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে পুলিস অবস্থানরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গ্রেপ্তার করলো এবং তাঁদের শিবির ভেঙে দিল। কয়েকজন বিধায়কও গ্রেপ্তার হলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। বিরোধী সদস্যরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর নিপীড়নের প্রতিবাদে দুই সভার যৌথ অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের সময় ওয়াক-আউট করবেন এইরকম সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নিয়ে রেখেছিল। রাজ্যপাল ভাষণ শুরু করলে, বিরোধী সদস্যরা তাঁকে বাধা দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ বাদে তাঁরা ওয়াক-আউট করেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নিয়ে ইতোপূর্বে গঠিত অল-পার্টি টিচার্স স্ট্রাগল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর নিপীড়নের প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বিধানসভার সামনে গণবিক্ষোভ দেখানো হবে। কংগ্রেস শিক্ষক আন্দোলনের সাথে কোনো সম্পর্কই রাখেনি। পি এস পি-র কোনো যৌথ আন্দোলনে অংশগ্রহণে অতীতে যেমন অনীহা দেখা গেছে, শিক্ষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। অল-পার্টি কমিটি থেকে তারা দূরেই থেকে যায়।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় পুলিস অন্তত চারশো শিক্ষক এবং গণআন্দোলনের কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করে মণিকুন্তলা সেন, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, শৈলেন রায় এবং ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে। জ্যোতি বসুকেও গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে না থাকায় পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কীভাবে গ্রেপ্তার এড়িয়ে বিধানসভায় পুলিসী নিপীড়নের ঘটনাগুলি তোলা যায়, সে সম্পর্কে তিনি একটা কৌশল স্থির করে ফেললেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি এক বন্ধুর মোটরগাড়িতে স্বাভাবিকভাবে তিনি বিধানসভা অভিমুখে রওনা হন। বিধানসভা ভবন কমপ্লেক্স-এর চারপাশে রাইফেলধারী পুলিসবাহিনী এবং সাদা পোশাকের গোয়েন্দা পুলিস মোতায়েন ছিল। তার মধ্যেই তিনি গাড়িতে বসে বিধানসভা ভবনের প্রধান ফটক

দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন। পুলিস বুঝতেই পারেনি, তিনি এইভাবে বিধানসভা ভবনে ঢুকে পড়বেন। পুলিস যখন বুঝতে পারলো, তখন তাঁকে কীভাবে গ্রেপ্তার করা যায় তাই নিয়ে উচ্চমহলে সলাপরামর্শ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভবনের মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করার চরম ব্যবস্থা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক হয়, বিধানসভার অধিবেশন মুলতবির পর তিনি যখন বিধানসভা ভবন কমপ্লেক্স-এর বাইরে বেরিয়ে যাবেন তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। একথা জানতে পেরে তিনি সভা মুলতবির পরেও বাইরে না যাওয়ার কৌশল স্থির করেন। বিধানসভার অধিবেশন চলার সময়ে তিনি অধ্যক্ষ শৈল মুখার্জির অনুমতি নিয়ে স্বাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, দিনের অধিবেশনের পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিবর্তনমূলক আটক আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। বিধায়ক হিসাবে জনগণের প্রতি এবং তাঁর নির্বাচনী এলাকার প্রতি তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করতে চান। তাই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিধানসভা ভবনের মধ্যে থাকার জন্য অধ্যক্ষের অনুমতি চান। জ্যোতি বসুর এই স্বাধিকারের প্রশ্নে অধ্যক্ষ রুলিং দেন, যদি কোনো সদস্য অধ্যক্ষের আশ্রয় চান, তাহলে তিনি গ্রেপ্তারের হাত থেকে নিরাপদ থাকবেন। অধ্যক্ষের অনুমতি পেয়ে তিনি বিধানসভা কমপ্লেক্স-এর ভেতরে আশ্রয় নেন এবং কয়েকদিন সেখানে থাকেন।

অল-পার্টি টিচার্স স্ট্রাগল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়োজিত ১৬ই ফেব্রুয়ারির বিধানসভা অভিযান বানচাল করার জন্যই কংগ্রেস সরকার শিক্ষক এবং গণ-আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু বিধানসভা অভিযান বানচাল করা যায়নি। ঐদিন বিকালে ৪০ হাজার মানুষের এক বিশাল মিছিল বিধানসভা ভবনের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের চেষ্টা করলে পুলিস প্রথমে মিছিলের সামনে থেকে অম্বিকা চক্রবর্তী, সুবোধ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। তারপরে মিছিলকারীদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে এবং গুলি চালায়। পুলিসের গুলিতে বিধানসভার সামনে ৬জন নিহত হন। আহত হন ১৫৭জন। কংগ্রেস সরকার সমগ্র কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু কলকাতা শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরের দিনেও কলকাতায় মিলিটারি ও পুলিসের উন্মত্ত আচরণ অব্যাহত থাকে। এদিনেও গুলি চলে। আন্দোলনের এই কয়দিনে প্রায় ছয় শত শিক্ষক ও গণ-আন্দোলনের নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মুক্তির দাবিতে ১৭ই ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা শেষ হবার পর জ্যোতি বসু বিধানসভা ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। পুলিস তাঁকে রেড রোডে গ্রেপ্তার করে। ৭দিন বিনাবিচারে আটক রাখার পর অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সমস্ত শিক্ষক ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেন। শিক্ষকদের এই গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। সবগুলি দাবির মীমাংসা না হলেও তাঁরা বেশ কিছু দাবি কংগ্রেস সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে ১২দিনব্যাপী এই শিক্ষক আন্দোলনের কাহিনী।

সৌজন্যে ঃ গণশক্তি, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৫

প্রতিবেদন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

ঐতিহাসিক চুয়ান্নর আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন সমাপ্তি অনুষ্ঠান

৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৫ • ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল

স্বর্ণাক্ষরে লেখা ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হলো ২০০৫ সালের শেষ দিনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। প্রত্যয়ী সকালে চুয়ান্নর আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মৃতিতে 'স্মরণ বেদী'তে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন ঐতিহাসিক আন্দোলনের অন্যতম অংশগ্রহণকারিণী নেত্রী মীরা চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, সমিতির সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ভবেশ মৈত্র, বর্ষীয়ান নেতা উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী, অমিতাভ সেন সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। পরে ইনস্টিটিউটের মূল ফটকের পাশে 'চুয়ান্নর ১২ দিনের আন্দোলনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলি' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মীরা চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার কাজ আরম্ভ করেন অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য। চুয়ান্নর আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরব থাকার পর ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, রাজ্য কমিটির সদস্যগণ 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' ও 'পথে এবার নামো সাথী' গান দুটি পরিবেশন করেন উদ্বোধন সংগীত হিসাবে। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবি আদায়ের প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হিসাবে ৫৪'র এই আন্দোলনকে যেমন চিহ্নিত করেন তেমনই সর্বস্তরের মানুষের সমর্থনপুষ্ট এই আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তকে ব্যর্থ করার যে প্রেরণা জুগিয়েছিল তার কথাও বলেন। তাঁর কথায় সমস্ত রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, ছাত্র ও যুব সংগঠন মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। তাই এই ঐতিহাসিক আন্দোলন শিক্ষা দেয়, শিক্ষকই হোন আর শ্রমজীবীই হোন, সর্বস্তরের বঞ্চিত মানুষের বাঁচার লড়াই একই সূত্রে বাঁধা। ১৯৫৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি সেই গণভিত্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। পরে সমিতির পক্ষ থেকে বামফ্রন্ট রাজ্য কমিটির সভাপতি মাননীয় বিমান বসুকে সংবর্ধনা জানান সভার



১৯৫৪'র শহিদ স্মরণে শহিদবেদীতে মাল্যদান করছেন সমিতির সদস্য ও নেতৃবৃন্দ।

সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। পুরুলিয়ার বিদ্যাসাগর আবাসিক বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাননীয় বিমান বসুর হাতে ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন অন্যতম সহ-সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য। মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসকে সংবর্ধনা জানান সমিতির সহ- সভাপতি রীতা সেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন মাননীয় বিমান বসু। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সমিতিকে অভিনন্দন জানান ৫৪'র এই গৌরবময় আন্দোলনের ঐতিহাসিক অধ্যায়কে ফিরিয়ে দেখার ব্যবস্থা করার জন্য। আগামীদিনের চলার পথকে সুসংবদ্ধ করার জন্য ফিরে দেখার এই কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমিতির জন্মলগ্নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম জড়িয়ে আছে তাই সমিতির এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে। তার একজনের নাম প্রসঙ্গত মনে আসে তিনি বিদ্যাসাগর। স্বাধীনতার পর রাজপথে প্রত্যক্ষ করেছি সেই সংগ্রাম। 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' স্লোগানে মুখর সারা দেশ। ১৯৪৯ সালের ঘটনা এটা। ১৯৫৩ সালের ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন আমাকে নাড়া দেয়।



'ঐতিহাসিক ৫৪'র স্মরণীয় মুহূর্তগুলি' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন ৫৪'র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিণী শ্রদ্ধেয়া মীরা চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন বিশেষভাবে নাড়া দেয়। বুনো রামনাথের জীবনী পড়ার পর শিক্ষকদের কষ্টের কথা অনুভব করি। শিক্ষকরা বেতন বাড়ানোর কথা বলছেন। এটা তো অন্যায় নয়। তখন যুগান্তরে জ্যোতিবাবুর শিক্ষকদের আন্দোলনের পক্ষে কথা বলা খুব বেরুত। বসুমতীতেও বেরুত। দেখতাম। তিনি বিধান রায়কে বলেছিলেন, 'মাষ্টার মশায়দের ব্যাপারটা কবে মিটবে। তারা তো রাস্তায় বসে আছে'। তাঁর ভাষণের মাঝে সভায় প্রবেশ করেন বিশিষ্ট জননেতা জ্যোতি বসু। মুহূর্তের মধ্যে সভাকক্ষের ভেতর মুহুর্মুহু স্লোগান উঠতে থাকে। 'জ্যোতি বসু তোমায় জানাই লাল সেলাম' ধ্বনিতে ফেটে পড়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। বিমান বসু আবার শুরু করলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি তখন ছাত্র ছিলেন। ধর্মঘটী শিক্ষকদের পুলিস ভ্যানে তুলছে দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি। বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে এর প্রতিবাদে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলে প্রধান শিক্ষক তাঁকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। আজকের শিক্ষক সমাজের কাছে সেই দিনের কথা শুনিয়ে তিনি বলেন, তখন গ্রান্ট ইন এইড স্কুলে শিক্ষকের বেতন ছিল ৭০ থেকে ৮০ টাকা। এই আওতার বাইরের স্কুলগুলির বেতনের কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। ৩০-৪০-৫০ যা খুশি। শিক্ষার দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের এতো কম বেতন দেখে মনেমনে রাগ হতো। আজকের মতো পেনশন, গ্রাচুইটি সে তো স্বপ্ন। শিক্ষকদের সেই আন্দোলন তাই মনে রেখাপাত করেছিল। শিক্ষকদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেবার লড়াইতে সামিল হয়েছিলেন জ্যোতি বসু। আত্মগোপন করতে হয়েছিল তাঁকে। জেলে যেতে হয়েছিল। আজকের উন্নত ব্যবস্থায় আত্মসমীক্ষার সুরে আত্মসমালোচনার কথা তুলে তিনি বলেন, অতীতে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা ছিল। তখন শতকরা ৯৮জনই তাঁদের দায়িত্বপালনে ব্রতী হতেন। বর্তমানে বেশিরভাগই দায়িত্বপালনে ব্রতী হলেও ৯৮ শতাংশই এ কাজ করে তা বলা যাবে না। কম হলেও ঐ অংশের শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা নিয়ে সংশয় আছে মানুষের মধ্যে। গণআন্দোলনের নাম করে 'ক্লাস নেই' এই যুক্তিতে অনেকেই বেরিয়ে যান। এটা ঠিক নয়। স্কুল শিক্ষায় তত অধোগতি

না হলেও, কলেজ শিক্ষায় হয়েছে। অতীত দিনের গৌরবকে ছুঁয়ে জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় আমরা কতটুকু এগোচ্ছি তা আমাদের ভাবার দিন এসেছে। আজ সেই শপথ আমাদের গ্রহণ করা উচিত। যার মধ্যদিয়ে সেই দায়বদ্ধতার দিকটি ফুটে উঠবে। এরপর আসে সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। শ্রদ্ধেয় জননেতা জ্যোতি বসুকে সংবর্ধনা জানান সাধারণ সম্পাদক। পরে তিনি 'চুয়ান্নর সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার' শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসুর হাতে '১৯৫৪ সালে শিক্ষক সমাবেশে ভাষণরত

দেবী ছিলেন। আমিও ছিলাম। জানি না সেই ছবিই আপনারা আমাকে দিলেন কি না। আপনাদের মর্যাদার লড়াই ছিল। প্রসঙ্গত ১৯৫৪ সালের সেই আন্দোলনের সময় বিধানসভার বাইরে শিক্ষকদের সমাবেশে চোঙা মাইক হাতে জ্যোতি বসু ভাষণ দিচ্ছেন। স্বাধীনতা পত্রিকার প্রকাশিত সেই ছবিটিই ল্যামিনেট করে স্মারক হিসেবে ঐদিন সভায় তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে শিক্ষকদের হয়ে বিধানসভায় কথা তুলবেন বলে বিরোধী নেতা হিসাবে বিধানসভার অধ্যক্ষের অনুমতি



৫৪'র সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় জননেতা জ্যোতি বসুকে সমিতির পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দিচ্ছেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জ্যোতি বসু' এই স্মারকচিত্রটি তুলে দেন সাধারণ সম্পাদক। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি খুবই আনন্দিত। আজ গণশক্তিতে একটি প্রবন্ধ পড়লাম। অনেক কথা মনে পড়ল। আমরা কমিউনিস্টরা মানুষের উপর নির্ভরশীল। মানুষের সাহায্য ছাড়া আমরা এগোতে পারিনি। পার্টি তখন ছোট ছিল। কত বিভিন্ন আন্দোলনে আমরা অংশ নিয়েছি। আজ আপনারা একটি ইতিহাস তৈরি করেছেন। আপনাদের সাহায্যে ৬বার আমরা সরকারে এসেছি। আমাদের ওপর কত অত্যাচার হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের ওপর লাঠি, গুলি চলেছে। সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আন্দোলনের শুরুতে আমরা ছিলাম। সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা

নিয়ে কীভাবে বিধানসভায় থেকে গিয়েছিলেন সে কথাও তিনি পাড়েন। তাঁর কথায়, শুনেছিলাম অধ্যক্ষকে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় পরে এরজন্য ধমক দিয়েছিলেন। সেই আন্দোলন প্রত্যাহারের পরও তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। পরে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে রেখেছিল ৭ দিন। আপনাদের সেদিনকার আন্দোলনের সাথী ছিলাম আমি। তাই আপনাদের ডাকে না এসে পারিনি। বর্তমান সরকারের কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। আমাদের সীমাবদ্ধতা মানুষকে বোঝাতে হবে। মানুষের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। নোতুনদের এই আন্দোলনে আনতে হবে। এই বয়সে আরও একটি সভায় আমাকে যেতে হবে। আপনাদের

এখানে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। পরে পরিবেশিত হয় এবিটিএ কলকাতা জেলা শাখার সদস্যবৃন্দের গান। 'তোমার পতাকা যারে দাও/তারে বহিবারে দাও শক্তি'। 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই।' 'এখন আর দেরি নয়' পরপর এই তিনখানি গান তাঁরা পরিবেশন করেন।

পরে বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৫৪ সালের শিক্ষা আন্দোলনকে স্মরণ করি। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যুগান্তরে রিপোর্ট দেখতাম। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। সমিতি তখন আন্দোলনের মধ্যে ছিল। ছিল দায়বদ্ধতা। ন্যূনতম দাবি ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে শিক্ষকরা সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে গিয়েছিলেন। সমাধানের জন্য। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আপনার যে চাপরাশি তিনিও আমাদের চেয়ে বেশি মাইনে পান। অথচ আমরা শিক্ষক তাদের চেয়েও কম বেতন পাই'। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। ঠিকই। তবে চাপরাশির পদ তো এখন শূন্য নেই। শূন্য হলে আপনারা যদি আবেদন করেন তবে তা সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করব'। এই চরম অপমানের প্রতিবাদ করে শিক্ষকরা বেরিয়ে যান। আজ সেই মর্যাদার লড়াইকে সম্মান জানানোর সাথে সাথে তৎকালীন সরকারের মনোভাবকে ধিক্কার জানাই। ২০০৫ সাল নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই বছরটি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এই বছরেই ২০০০ জুনিয়র স্কুলকে হাইস্কুলে এবং ২৫৪টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা হয়েছে। তার জন্যে যথেষ্ট শিক্ষক লাগবে। রাজ্যে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-মাদ্রাসা মিলিয়ে ২২ হাজার অতিরিক্ত শিক্ষকপদ তৈরি হয়েছে। তাতে নিয়োগের জন্য বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগের লিখিত পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এখন মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। অপরদিকে এ বছরই বিদ্যালয় পরিকাঠামো উন্নয়নে ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে ১০ কোটি টাকা আগেই বরাদ্দ হয়েছিল। সম্প্রতি অর্থদপ্তর আরও ৬৫ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। যার মধ্যে ৫২ কোটি টাকা গৃহনির্মাণ বাবদ ব্যয় হবে। এছাড়া ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরী ইত্যাদি ক্ষেত্রেও টাকা ব্যয় হবে। আমি খোজ নিয়ে দেখেছি এক বছরে একটি রাজ্যে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৭৫ কোটি টাকা কোথাও বরাদ্দ হয়নি, যা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। তিনি বলেন, ২০০৬ সালে রাজ্যে চতুর্দশ বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা। শূন্যপদে জরুরী ভিত্তিতে, প্রয়োজনভিত্তিক নিয়োগের কথা উঠতেই কিছু মিডিয়া ও বিরোধী দলগুলি বলতে শুরু করেছে এসব নাকি সেই ভোটের দিকে তাকিয়েই। গত বছর এ রাজ্যে ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ২০০৬ সালে এখনও পর্যন্ত যা হিসেব পেয়েছি তাতে ৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবছর পরীক্ষায় বসবে। তাহলে এ ঘটনাকেও সংবাদমাধ্যম ও বিরোধীরা কী বলবেন? এও কি ভোটের জন্যে বেড়ে গেল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার 'এলিমেন্টারি এডুকেশন ইন্ডিয়া' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে শিক্ষার মানের দিক থেকে উন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নামও আছে। কেন্দ্রীয়



৩১-১২-২০০৫ তারিখে বীরভূমের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী অভিনীত 'ফিরে দেখা' নাটকের একটি দৃশ্য



৩১-১২-২০০৫ তারিখে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ও অতিথিবৃন্দের একাংশ

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং সম্প্রতি ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন যখন অন্যান্য রাজ্যগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে না তখন পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে ছাত্রছাত্রী বাড়ছে। এর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তিনি চান। সে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সেই রিপোর্টে রাজ্যে মহিলা জনসংখ্যার চেয়েও ছাত্রীদের অনুপাত বেশি। জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ মহিলা পশ্চিমবঙ্গে। আর ছাত্রছাত্রীদের ৪৯ শতাংশ ছাত্রী। এই গৌরবের মালিক বিদ্যাসাগর। বামফ্রন্ট সরকার নয়। পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান এত বাড়তো না যদি-না শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই দায়িত্ব নিতেন। এই রাজ্যের অগ্রগতির ইতিহাসের নেপথ্যে রয়েছে শিক্ষক আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস। তারই মধ্যে কখনও কখনও প্রধান শিক্ষকের ভুলে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার আবেদনপত্র যথাস্থানে জমা পড়ে না। এই অবহেলা কেন হবে? কেনই বা পরীক্ষকদের একটা অংশ পরীক্ষার খাতা দেখার সময় দু-তিনটি প্রশ্নের উত্তর না দেখেই ছেড়ে দেবেন। কেন এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে। তারও আত্মসমীক্ষা হওয়া দরকার। প্রতিভাকে বিকাশ করার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আরও অগ্রসর হবেন। আজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের আত্মহত্যার প্রবণতা আমাদের কষ্ট দেয়। ছাত্রছাত্রীদের মুখ দেখে তাদের ব্যথা, বেদনা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তবেই সার্থক হবে এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিনকে স্মরণ করা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ভবেশ মৈত্র বলেন, হাওড়ায় কর্মসূত্রে কাজ করার সময় যাওয়া-আসার পথে আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতাম। চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে আজ আমরা অনেক বেশি অগ্রণী। এটাই আশঙ্কার। তবুও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও এক বিরাট অংশের শিক্ষক আছেন যাঁরা এই দায়িত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আজ সেই বোধের দ্বারাই আমাদের উৎসাহিত হতে হবে। পরিবেশ আমাদের বাধা দিচ্ছে। সেই বাধাকে আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সমাসীন। নিজেকে রক্ষার লড়াই আজ প্রাসঙ্গিক।

পরে সংগীত পরিবেশন করেন মনোমিতা ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। সবশেষে ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্মরণে রচিত নাটক 'ফিরে দেখা' মঞ্চস্থ হয়। বীরভূম জেলা সমিতির সদস্যবৃন্দ এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ', 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি দীর্ঘজীবী হোক্'—সভায় উপস্থিত সদস্য-সদস্যাদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত এই ধ্বনির মধ্যদিয়ে এই ঐতিহাসিক সভাটির সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

প্রতিবেদক ঃ অশোক অধিকারী

স্কুল টিচার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (STFI) তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন

কমরেড অমল ব্যানার্জী মঞ্চ • কমরেড এ ভেঙ্কটস্বামী নগর
১৭-১৮ ডিসেম্বর, ২০০৫

STFI-এর তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন গত ১৭-১৮ ডিসেম্বর '০৫ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর সকাল ১০টায় পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি ডি রামী রেড্ডি। তারপর শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সমাগত নেতৃবৃন্দ।



এস টি এফ আই-এর তৃতীয় বার্ষিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখছেন সমিতির সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্মেলনের সূচনায় স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সহ-সভাপতি ডঃ পি রামাইয়া। এরপর সম্মেলনের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অর্জুন দেব (প্রাক্তন অধ্যাপক, এন সি ই আর টি), কমরেড সাধু (সাংসদ), কমরেড থমাস যোসেফ (সভাপতি, (AIFUTCO), কমরেড এস ভিরাইয়া (ন্যাশনাল সেক্রেটারী, সিটু), অরুণ কুমার (সভাপতি, এস এফ আই), পি বুচি রেড্ডি (সাধারণ সম্পাদক, নবোদয় বিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থা)। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি (সাংসদ) সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন এবং বিশেষভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০০৫ এবং সর্বনাশা পেনশন বিল সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করেন। এরপর দিনের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন অর্থাৎ প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয় সাধারণ সম্পাদক তুষার পঞ্চাননের খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপিত করার মধ্যদিয়ে। কমরেড় পঞ্চানন তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, ২০০৩ সালে কেরালার পালাক্কাডে দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের পরে সারাবিশ্বের পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইরাকের পরে ইরানকে কোণঠাসা করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে আমেরিকা। তারফলে খোদ আমেরিকাতেই প্রচন্ড বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। বুশ-ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে আমেরিকা-ইংল্যান্ডের মানুষ সোচ্চার হচ্ছে। বেলজিয়াম, গ্রীস, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্সের শ্রমজীবী মানুষ পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে সমাজতন্ত্র ছাড়া পথ নেই। একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য ও সমস্যা দূর করতে।

তিনি জানান, গত ২০০৪-এ আমাদের দেশে লোকসভা নির্বাচনে এন ডি এ জোটের পরাজয়ের পর কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হয়েছে ইউ পি এ জোট। বামপন্থীদের সমর্থনে এই সরকার গঠিত হয়েছে। কতকগুলি ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে এই সমর্থন। ফলে দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা গেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিপদ দূর হয়নি। আমাদের সজাগ থাকতে হবে। দেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়ন করতে হবে।



এস টি এফ আই-এর তৃতীয় বার্ষিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ

তিনি দেশের সমস্ত প্রগতিশীল গণতন্ত্রপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষক সংগঠনকে STFI-এর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে দেশের জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্রতী হতে আবেদন জানান, সকলের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার অনুরোধ জানান। এরপর কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের ওপর ২দিন ধরে ২৭ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতা জেলা শাখার সহ-সম্পাদিকা চিন্ময়ী দে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রতিনিধিদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সম্পাদক তার জবাবী ভাষণ দেন।



এস টি এফ আই-এর তৃতীয় বার্ষিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে সমিতির প্রাক্তন প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জি নামাঙ্কিত মঞ্চে উপবিষ্ট এস টি এফ আই-এর নেতৃবৃন্দ

এরপর সভাপতিমন্ডলী খসড়া প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংশোধনী সহ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিদের সম্মতি প্রার্থনা করেন। সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। এরপর নতুন কাউন্সিলের নামের প্রস্তাব রাখেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক। প্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। এরপর কাউন্সিলের সদস্যদের সমর্থনের ভিত্তিতে ১৬ জনের সম্পাদকমন্ডলী ও ২৭ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। নব-নির্বাচিত সভাপতি হলেন কার্তিক মন্ডল এবং সাধারণ হলেন কে রাজেন্দ্রন। সভাপতিমন্ডলীর পক্ষে কে রামী রেড্ডির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

সম্মেলনে মোট ৫৬২ জন প্রতিনিধি এবং পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন। ৫৩৩ জন ক্রেডেনশিয়াল ফর্ম পূরণ করেন। তাঁদের মধ্যে ৪৭০ জন পুরুষ এবং ৬৩ জন মহিলা ছিলেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ১৭টি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম ধর্মঘটের অধিকার রক্ষা, জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০০৫-সহ মোট ১৫টি প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়।

আমার জীবনে শিক্ষকের অবদান

কান্তি বিশ্বাস

বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু', কথাটি যে অতীব সত্য আজ নতুন করে মর্মে মর্মে অনুভব করছি। 'শিক্ষা দর্পণ'-এর সম্পাদক আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ। 'শিক্ষা দর্পণ' পত্রিকায় 'আমার শিক্ষক' শিরোনামে প্রতি সংখ্যায় একটি করে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'শিক্ষা দর্পণ'-এর সম্পাদক এক বছরেরও বেশী সময় ধরে আমাকে অনুরোধ করে চলছেসন যেন এই শিরোনামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। এই জাতীয় কিছু লিখতে আমার প্রচন্ড আপত্তি। আমি মোটেই চাই না আমার জীবনের এই বেদনা-ঘন, অম্ল-মধুর, কঠিন দিনগুলির কথা বাইরে প্রকাশিত হোক। বাল্যের, কৈশোরের প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করার কাহিনীগুলি যে আমার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। তার ভাগ কাউকে দিতে মন চায় না। 'আমার শিক্ষক' সম্পর্কে কিছু বলতে হলে সেই অতীতের কঠিন দিনগুলির কথা স্বাভাবিক ভাবে বলতে হয়। আমার আপত্তি এইখানেই। কিন্তু অবশেষে ওর একান্ত অনুরোধ বা আবদারের কাছে হার মানলাম। সেজন্য আমার জীবনের বিভিন্ন সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কয়েকজনের অমূল্য অবদানের কথা কিঞ্চিত পরিমাণে লিখতে এই প্রবন্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি।

আমার বিদ্যালয় জীবন কেটেছে প্রধানত পরাধীন ভারতে। সেই যুগে প্রাথমিক শিক্ষকেরা ছিলেন আর্থিক দিক দিয়ে নিদারুণভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। আর্থিক অভাবের তাড়নায় বিপর্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মুখের অতীব মুল্যবান কথা এখনও যেন কানে ধ্বনিত হয়। তাঁদের দরদ-মাখা, প্রাণ-ঢালা, প্রেরণা-সৃষ্টিকারী ভূমিকা এখনও যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে। সকল শিক্ষকের কথা একটা প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে একজন শিক্ষকের কথা শুধু বলছি। এই প্রাথমিক শিক্ষকের নাম ছিল হরবিলাস বিশ্বাস। মাঝে মাঝেই সকল ছাত্রছাত্রীকে কাছে ডেকে নিয়ে বলতেন আমাদের বাড়ীতে কারুর কোনো অসুবিধা আছে কি না, আমাদের মনের কোণে কোনো জিজ্ঞাসা আছে কি না, আমাদের কোনো ক্ষোভ আছে কি না, আমাদের কিছু না-বলা কথা আছে কি না। আদর করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করতেন। সবাই প্রাণ খুলে তাঁর কাছে সকলের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা বলত। আমি কিন্তু বলতাম না। অবশেষে একদিন আমার জীবনের কিছু কথা বলতে অন্য সহপাঠীদের দ্বারা প্ররোচিত হই। আমাকে যখন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কাছে ডেকে বললেন আমার কিছু একান্ত আপন কথা আছে কি না? আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে বললাম, একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। আমি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আমার পিতার মৃত্যুর ২১ দিন পরে আমার জন্ম। সেটা কি আমার অপরাধ? অথচ পিতার মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করার জন্য কোনো পূজা-অর্চনা, আনন্দ-অনুষ্ঠানে যেখানেই যাই, সেখানেই বড়রা আমাকে তাড়িয়ে দেন। তাদের কথা 'অলুক্ষণে ছেলে, বাপ-খেকো ছেলে, ও থাকলে অনুষ্ঠানের অমঙ্গল হবে।' আমি শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম আমার অপরাধ কোথায়। আমার মনে পড়ে শিক্ষকমশায় সজল নয়নে আমাকে কাছে ডেকে মাথায় স্নেহমাখা হাত রেখে বললেন, 'ওরা মূর্খ, লেখাপড়া জানে না, সেজন্য এই অন্যায় আচরণ করে।' আমার কাজ হবে বড় হয়ে সকলকে লেখাপড়া শেখানো। যাতে ঐ রকম দুর্ব্যবহার ভবিষ্যতে আর কেউ না পায়। আমিও সেদিন ভাবলাম আমি বড় হয়ে লেখাপড়া শেখানোর কাজ করব। আমার কর্মজীবনে স্মৃতির গভীর থেকে এই কথাটা বারে বারে আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। আর নিজের কাছে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, শিক্ষকদের কাছে দেওয়া আমার অঙ্গীকারকে আমি জীবনে কতখানি পূরণ করতে পেরেছি?

আমি যখন নিচু ক্লাসে পড়ি, তখন জানুয়ারী মাসে আমি প্রায় কোনোদিনই স্কুলে যেতে পারতাম না। আমাদের যেখানে বাড়ী সেটা ছিল নিচু এলাকায়। বর্ষাকালে চারিদিক জলে থৈ থৈ করত। ডিসেম্বর মাসে জল নেমে যেত। জানুয়ারী মাসে শুরু হতো ধান কাটা। আর জমি থেকে যখন ধান কেটে নিয়ে যেত তখন কিছু পাকা ধানের শিস ভেঙে ভেঙে জমিতে পড়ত। আমি গোটা জানুয়ারী মাস সকালবেলা ঠান্ডা ভাত খেয়ে বেতের ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম মাঠে মাঠে। যে জমিতে ধান কাটা হয়েছে সেখানে যে পাকা ধানের শিস পড়ত, সেগুলো সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখতাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই কাজ করতাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরে আসতাম। মায়ের কাছে ধান জমা দিতাম। মা করুণ চাহনি মেলে আড়ষ্ট হাতে তা তুলে নিতেন। গোটা জানুয়ারী মাস চলত এই কাজ। এই সময় আমার বিদ্যালয়ে যাওয়া হতো না। কারণ সারা বছর সংসারের একটা মোটা অংশের খরচ এইভাবে শিস-ভাঙা ধান সংগ্রহ করে আমাকে চালাতে হতো। যখন ফেব্রুয়ারী মাসে স্কুলে যাওয়া শুরু করতাম, তখন আমার শিক্ষকেরা সকলে বলতেন, "তোর সব কথা আমরা জানি। এই এক মাসে যতটুকু পড়াশুনা হয়েছে, পরবর্তী এক মাসে তোকে তা পুষিয়ে দেবো।" আমার পেটের খিদে থাকা সত্ত্বেও আমাকে স্কুল থেকে ছাড়তেন না। বাড়তি একটা সময় ধরে যে সমস্ত পড়া হয়ে গেছে সেগুলো আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। শিক্ষকের এই দরদ আমাকে লেখাপড়া শিখতে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তা ক'জনের ভাগ্যে জুটেছে জানি না। ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করতে একজন শিক্ষক যে কী আকাশচুম্বি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তা সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যখন পড়ি, আমাদের বিদ্যালয়ের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। দেশবিভাগ-জনিত কারণে আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ভারতের দিকে পাড়ি দিয়েছেন। ছাত্রের সংখ্যা খুব কম। আমাদের প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল গিরিজাপ্রসন্ন শর্মা। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ। আমরা ছাত্ররা তাঁকে খুব ভয় করতাম। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার আগে টেস্ট পরীক্ষা হয়। টেস্ট পরীক্ষার পরে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ফি দিয়ে ফরম পূরণ করতে হয়। ফি-এর জন্য যে টাকা লাগবে সেই টাকা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আমি আমার শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষককে বললাম আমি ফরম পূরণ করতে পারব না। যেহেতু ফি-এর টাকা আমি জোগাড় করতে পারব না। প্রধান শিক্ষক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যথা-ভরা মনে বললেন আমার ফরম যদি পূরণ করা না হয় তাহলে অন্য কারো ফরমে তিনি সই করবেন না। এই কথা বলে উনি চুপ করে থাকলেন। আমি কিছুক্ষণ পরে প্রধান শিক্ষকের ঘর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসলাম। মনে মনে অনুভব করলাম শিক্ষকমহাশয়ের কী অপরিসীম করুণা আমাদের প্রতি। ফরম পূরণ করার শেষ দিন ঘনিয়ে আসল। আমার সহপাঠীরা আমাকে বাড়ীতে এসে ধরল। তাদের কথা প্রধান শিক্ষকমহাশয় কারো ফরম ধরছেন না। উনি বললেন বিদ্যালয়ের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র যদি ফরম পূরণ করতে না পারে, তাহলে আর কারো ফরম উনি পূরণ করবেন না। অন্য শিক্ষকদের কেউ যদি পারেন, তিনি তা করবেন। আমার সহপাঠীরা বারে বারে আমাকে বলল, 'চল যাই একসঙ্গে, বিভিন্ন বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করি'। আমি দ্রুত সেই সিদ্ধান্তে রাজি হলাম। দু'দিন ধরে আব্দুল হাসিম, কৃষ্ণপদ দে প্রভৃতি বন্ধুদের নিয়ে ধারে কাছে কয়েকটি গ্রামে আমরা আমার পরীক্ষা ফি-এর জন্য ভিক্ষে প্রার্থনা করলাম। দু'দিনেই প্রয়োজনীয় টাকা হাতে এসে গেল। পরে আমরা স্কুলে একসঙ্গে ঐ পরীক্ষার ফরম পূরণ করলাম। প্রধান শিক্ষক গিরিজাপ্রসন্ন শর্মা সবাইকে ডেকে সযত্নে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করি, তোরা সকলে যেন প্রকৃত মানুষ হতে পারিস। তোরা বড় হয়ে লক্ষ্য রাখিস অর্থের অভাবে কোনো ছাত্র-ছাত্রী যেন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়'।

অবশেষে আসল মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার দিন। আমাদের বিদ্যালয়টি ছিল মহকুমা শহর থেকে অনেক দূরে। মহকুমা শহর ছিল মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার কেন্দ্র। সেখানে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে। টেস্ট পরীক্ষার ৩ মাস পরে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই ৩ মাসের মধ্যে যে জামাটা আমার ছিল তা সম্পূর্ণভাবে ছিঁড়ে গেছে। ফলে ভাবলাম যে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে যাব কী করে। গায়ে কী পরব। একবার চিন্তা করলাম পরীক্ষা দিতে যাবই না। একদিন আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর পরীক্ষা কবে ? আমি বললাম, পরীক্ষা দিতে যাব না। আমার জামা নেই। উনি বললেন, আমার জামাটা তোকে দিয়ে দেবো। পরীক্ষা দিয়ে তা আমাকে আবার ফেরৎ দিস। পরীক্ষা দেবার কথা চিন্তা করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতে রাজি হয়ে গেলাম। দাদা ছিলেন আমার থেকে একটু লম্বা। তার জামা গায়ে দিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলাম মহকুমা শহরে। প্রথম দিন ছিল ইংরাজী পরীক্ষা। বা হাতে কালির দোয়াত,

আর ডান হাতে একটা হ্যান্ডেল কলম। পরীক্ষা কেন্দ্রে অর্থাৎ যে বিদ্যালয়ে আমার আসন পড়েছিল, সেই বিদ্যালয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। বহু ছাত্র-ছাত্রী হুড় হুড় করে বিদ্যালয়ে ঢুকে যাচ্ছে। আমাকে একজন শিক্ষক দাঁড় করালেন, ঢুকতে বাঁধা দিলেন এবং বললেন আমি কেন এত লম্বা জামা পরে এসেছি। উনি আরো বললেন, 'তোমার সমস্ত দেহ অনুসন্ধান না করে পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেব না।' আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে ক্ষোভে অপমানে আহত হয়ে একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই নাকি তাঁকে ভীষণ সমীহ করতেন। প্রধান শিক্ষকের নাম নরেশ দাশগুপ্ত। তিনি যখন স্কুলে ঢুকতেন, শুনেছি ছাত্র-ছাত্রীরা একটু টু-শব্দ পর্যন্ত করতে ভয় পেত। অত্যন্ত রাশভারী মানুষ ছিলেন তিনি। হঠাৎ তিনি বারান্দায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আমার মুখের দিকে তাকালেন। শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন?' শিক্ষক বললেন, 'ওর পোষাক দেখে অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ওকে সার্চ করে পরে পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেবো। হঠাৎ প্রধান শিক্ষক অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। শিক্ষককে ধমক দিয়ে বললেন, 'আপনি শিক্ষকতা করছেন অথচ ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বুঝতে পারেন না। কেন শিক্ষকতা করতে এসেছেন।' উনি জোরের সাথে বললেন, 'ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এটা কি বোঝেন না যে, একটা একান্ত নিরীহ ছেলেকে অযথা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।' প্রধান শিক্ষক আমার কাছে এসে মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাও, তুমি পরীক্ষা দিতে যাও। আশীর্বাদ করি পরীক্ষায় ভালো ফল করো। তোমাকে যে শিক্ষক এত সময় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তাঁর জন্য তুমি এতটুকু দুঃখ করবে না, কারণ আমি তো তোমার সামনে শিক্ষককে বকে দিয়েছি।' ভাবলাম কী হৃদয়বান ছাত্রবৎসল শিক্ষক। পরবর্তীকালে অনেক দিন ধরে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছি। মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই প্রধান শিক্ষকের মুখ-ছবি। মনে পড়ত তাঁর ছাত্রদরদী অনুভূতি, তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তরদৃষ্টি। আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি William Arthur Ward-এর সেই কথা — mediocre teacher tells, good teacher explains, superior teacher demonstrates & great teacher inspires, বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের এই অনুপ্রেরণাকারী ব্যবহার না পেলে যতটুকু লেখাপড়া পরবর্তী জীবনে শিখেছি তার কিছুই হয় তো সম্ভব হতো না। শিক্ষকের ব্যবহার ছাত্রকে যে কতখানি অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে পারে তা অন্তর দিয়ে সেই দিনগুলিতে অনুভব করেছি। পরবর্তী জীবনে সেই অনুভব আরো সমৃদ্ধ হয়েছে বই এতটুকু হ্রাস পায়নি।

মেট্রিকুলেশন পাশ করে ভর্তি হলাম কলেজে। ইন্টারমিডিয়েট এখন যা উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল, সেই কলেজে ভর্তি হলাম। সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ একদিন আমাদের ক্লাসে গিয়ে বললেন একটা আনন্দের সংবাদ। সারা পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আমাদের কলেজে আসছেন। তিনি আমাদের কলেজ পরিদর্শন করবেন। সেই সম্পর্কে আজকে ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের নিয়ে একটা সভা আমি ডেকেছি। তোমাদের ইচ্ছা করলে সেই সভায় থাকতে পার। কলেজ ছুটির পরে আমরা বেশ কিছু ছাত্র জমায়েত হলাম কলেজের অফিস ঘরের সামনে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ অসিতারঞ্জন ভট্টাচার্য সহ বেশ কয়েকজন অধ্যাপক। পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আমাদের কলেজে আসতে সম্মতি দিয়েছেন। অধ্যক্ষ বললেন, আমাদের কলেজের অনেক সমস্যা আছে, আমরা সেইসব সমস্যার সমাধান করে কলেজের আরো উন্নতি করতে চাইছি। যখন শিক্ষামন্ত্রী আসছেন, তখন তাঁর কাছে একটা স্মারকলিপি দেওয়া আমাদের উচিত। আমরা সবাই হাত তুলে বললাম, খুব ভালো হয়। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ মহাশয় বললেন, এই স্মারকলিপি পাঠ করে তা প্রদান করবে একজন ছাত্র। যেহেতু কলেজটি ছাত্রদের। এই প্রস্তাবে অধ্যাপকেরা সায় দিলেন। তখন প্রশ্ন উঠল, কোন্ ছাত্র এটা পাঠ করবে? একজন অধ্যাপক এটা জিজ্ঞাসা করলেন অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে তিনি বললেন, বাৎসরিক পরীক্ষায় কলেজের মধ্যে যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সেই ছাত্রটি এটা পাঠ করে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে তা অর্পণ করবে। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, কেননা এই সর্বোচ্চ নম্বর কীভাবে যেন আমি পেয়েছিলাম। আমি কথাটা শুনে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণের জন্য সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরে যখন একজন অধ্যাপক আমার দিকে আঙুল তুলে বললেন আমাকেই ঐ স্মারকলিপি পাঠ করতে হবে — আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললাম, আমি এটা পারব না। তখন অধ্যক্ষ মহাশয় কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ইংরাজীতে স্মারকলিপি আমি লিখে দেব, তুই ভাল করে পড়ে রাখবি। ৪/৫ দিন আগে এটা তোকে দিয়ে দেবো, বাড়িতে বসে

এটা ভালভাবে পড়ে নিবি, যাতে গড় গড় করে শিক্ষামন্ত্রীর সামনে পড়তে পারিস।' সকল ছাত্র বলল, এত ভাল সুবর্ণ সুযোগ কেন নষ্ট করবি। এটা তো আমাদের সকলের গৌরব। আমি কাচুমাচু করে রাজি হয়ে ঘাড় নাড়লাম। কয়েক দিনের মধ্যে অধ্যক্ষ মহাশয় সেই স্মারকলিপি ইংরাজীতে টাইপ করিয়ে তা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়, কেমন হচ্ছে শুনি'। আমি পড়লাম। দু'একটি উচ্চারণ ঠিক করে দিয়ে উনি বললেন, যাও, ভালভাবে পড়ে নাও যাতে শিক্ষামন্ত্রীর সামনে সুন্দরভাবে পড়তে পার।' তিনি মনে করিয়ে দিলেন ঐদিন শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যেমন থাকবেন, তেমনই উপস্থিত থাকবেন শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকগণ। আমরা একটা সুন্দর সুযোগ পেয়েছি, তাকে কাজে লাগাবই। তোমার জীবনেরও একটি অসাধারণ সুযোগ। একে কাজে লাগাবই। আমি ঘাড় নেড়ে অধ্যক্ষের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে চলে এলাম। আমি কলেজে আসতাম প্রায় ৫ কিলোমিটার দূর থেকে পায়ে হেঁটে। আমার মামার একটি মুদির দোকান ছিল। সেই মুদির দোকানে আমি থাকতাম। দোকানে বসে কেনাবেচাও করতাম। দোকানের পিছনে একটা ছোট্ট খাটিয়া থাকত। সেখানে রাত্রি যাপন করতাম। আর ওখানে পড়াশুনা করতাম। হাতে কোন ঘড়ি ছিল না। দোকানেও কোনো ঘড়ি ছিল না। রৌদ্র আর ছায়া দেখে বুঝতাম কখন স্নান করতে যেতে হবে আর কখন কলেজের দিকে রওনা হতে হবে। এইভাবে ৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে কলেজে যেতাম। যেদিন মন্ত্রীমহাশয় আসবেন, তার আগের দিনে কলেজে গিয়েছিলাম। সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে ডেকে বলে দিলেন কোন্ সময়ের মধ্যে আমাকে কলেজে হাজির হতে হবে। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, আমি ঠিক সময়ের মধ্যে কলেজে হাজির হব। যেদিন শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কলেজে আসার কথা, সেদিন ছিল মেঘলা দিন। সূর্যকিরণ প্রকাশ পায়নি। ছায়াও পড়েনি। আমি কিছু অনুমান করতে না পেরে দ্রুত যখন কলেজের কাছে গেলাম, দেখলাম চারদিকে পুলিশ। কলেজের গেটে ঢুকতে গিয়ে পুলিশের কাছে বাঁধা পেলাম। ওরা বললেন কলেজে শিক্ষামন্ত্রী এসেছেন, বাইরের কোনো লোককে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমি জোড় হাত করে বললাম, 'আমি এই কলেজের ছাত্র, সেই কারণেই এসেছি।' তারা তা বিশ্বাস করলেন না। তাদের সম্পূর্ণভাবে দোষ দেওয়া যায় না। আমাকে ঢুকতে না দেওয়ার পিছনে একটা কারণও হয়তো ছিল। তখন পাকিস্তানে আমেরিকা থেকে চিনি আসত বিশেষ ধরনের এক কাপড়ের ব্যাগে। চিনি খালাস হওয়ার পর সেই ব্যাগ বিক্রী হতো। দাম ছিল চারআনা। সেইরকম একটা চিনির ব্যাগকে কেটে তৈরী করা হয়েছিল আমার হাফ প্যান্ট। আর গায়ে ছিল হাফ শার্ট। দূর থেকে কলেজে আসতাম। দু-একটা বই বা-কাঁধে রাখতাম। সেজন্য বাদিকের হাতাটা একদম ছিল না। ছিল শুধু ডানদিকের হাতাটা। আমার এই পোষাক আর আমার চেহারা দেখে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে আমি এই কলেজের ছাত্র হতে পারি। তখন আমি ওদের দেখালাম আমার এই সেই অধ্যক্ষের প্রদত্ত টাইপ-করা কাগজটি। তখনও ওরা সম্পূর্ণভাবে আমাকে উপেক্ষা করলেন। আমি বেপরোয়া হয়ে জোর করে তাদেরকে এড়িয়ে গিয়ে কলেজে ঢুকতে গেলাম। তখন একজন পুলিশ কনস্টেবল আমার ঘাড়ে একটা হাত, আর কোমরে একটা হাত রেখে আমাকে শূন্যে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আছাড় খেয়ে পড়ার ফলে আমার নাক, কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। আমি কলেজে ঢুকতে পারলাম না। ব্যর্থতার গ্লানি, চরম হতাশা, বুক-ভরা অভিমান ও সুবর্ণ সুযোগ হারানোর দুঃখ নিয়ে ফিরে আসলাম আমার থাকার জন্য নির্ধারিত স্থান, সেই মুদির দোকানে। প্রায় ৭/৮ দিন কলেজে গেলাম না। যেহেতু ক্ষত তখনও দেহের বিভিন্ন জায়গায় রয়ে গেছে। পরে যখন কলেজে গেলাম, ঢুকতেই অধ্যক্ষের নজরে পড়লাম। কয়েকজন অধ্যাপকও সেখানে ছিলেন। তাদের সামনে অধ্যক্ষ আমাকে যৎপরোনাস্তিভাবে ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর সামনে স্মারকলিপি পাঠ করার এ-হেন সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছ, জীবনে আর তা পাবে! আর উপায়ন্ত না দেখে শেষে কি না এই স্মারকলিপি আমাকেই পাঠ করতে হলো।' প্রচণ্ডভাবে আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। মাথা নিচু করে থাকলাম। ঠিক সেই সময় একজন অধ্যাপক, যিনি ঘটনাটা পরে শুনেছিলেন, তিনি অধ্যক্ষকে ঐ দিনের ঘটনাটি সংক্ষেপে বললেন এবং বলতে বলতে সেই অধ্যাপক চোখের জল ফেলে দিলেন। অধ্যক্ষ শুনে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি তোর অধ্যক্ষ, তুই আমার ছাত্র।' তিনি করজোরে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর কাছে আমি ক্ষমা চাই, তুই আমাকে ক্ষমা কর। আর যে সুযোগটা হারিয়েছিস, আশীর্বাদ করি পরবর্তী জীবনে এর থেকে বড় সুযোগ যেন তোর ভাগ্যে জুটে।' মাথা নত করে অধ্যক্ষকে প্রণাম করে ক্লাস-ঘরে চলে গেলাম। আর মনে-প্রাণে অনুভব করলাম অধ্যক্ষের স্নেহমাখা আশীর্বাদ। প্রায় আড়াই দশক ধরে ভারতে বিভিন্ন

প্রান্তে এবং দু-একবার বিদেশের মাটিতে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ এসেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে স্মারকলিপি অথবা অভিনন্দনপত্র পেয়েছি। সেইসময় কখনও কখনও অবাধ্য মনের কোনো বে-আড়া চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ঐ দিনের ঐ অর্থবহ ঘটনা। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করলাম। শহরবাসী এবং কলেজের পক্ষ থেকে আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সম্বর্ধনার উত্তরে একটি কথাই বলেছিলাম, আজ যে ফলাফলের জন্য আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে তারজন্য সবটুকু কৃতিত্ব আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের, আমার কিছুই নেই এর মধ্যে। সেই অধ্যক্ষের মুখে সেদিন দেখেছিলাম এক অনির্বচনীয় সাফল্যের জ্যোতি।

অনেক দূরে ঢাকা শহরে ভর্তি হলাম কলেজে। স্নাতক স্তরের পাঠক্রমে প্রচুর ছাত্র। শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ সেখানে একেবারেই কম। শেষে একটা ঘটনা ঘটে গেল। আমার অন্যতম বিষয় ছিল রাশিতত্ত্ব (স্ট্যাটিসটিকস্)। আমাদের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল দেড়শোর উপর। আমি সাধারণত একেবারে পিছনের বেঞ্চে বসতাম। কলেজের ক্লাস চলছে প্রায় ৬ মাস হলো। হঠাৎ একদিন সুলতান স্যার আমাদের রাশিতত্ত্বের ক্লাসে পড়াচ্ছেন। আমাদের কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তিনি আমাদের ক্লাসেরই ছাত্র। উঠে দাঁড়িয়ে ইংরাজীতে বললেন, আমাদের পঠিতব্য বিষয়টি বেশ কঠিন। আপনি সবই ইংরাজীতে পড়াচ্ছেন। কতকগুলি জিনিস আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আপনি দয়া করে একটু বাংলায় বলে দিতে পারলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমাদের সময়ে কলেজে বাংলা সাহিত্য ছাড়া সবকিছু ইংরাজীতে পড়ানো হতো। পরীক্ষায় আমাদের ইংরাজীতে উত্তর লিখতে হতো। কলেজের অধ্যাপকগণ বাংলায় নয়, সবকিছুই ইংরাজীতে পড়াতেন। ঐ অধ্যাপক ছিলেন অবাঙালী। প্রকৃতপক্ষেই তিনি বাংলা বলতে পারতেন না। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত এবং ছাত্র-দরদী। ছাত্রদের অসুবিধার কথা বুঝতে পেরে ক্ষোভের সাথে বললেন, 'মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা উচিত। আমাদের দেশে সে সুযোগ নেই।' তিনি বললেন, 'জানি না কবে এই সুযোগ আসবে। আমার জীবদ্দশায় এই সুযোগ আসবে কি না জানি না।' তারপরই আর একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটল। কলেজে আমার রোল নং ছিল ১১৩। প্রতি ক্লাসেই রোল কল করা হয়। উনি খাতা খুলে বললেন ১১৩ নম্বর যার রোল সে এখানে এসো। আমি প্রথমে বুঝতেই পারলাম না। পাশে একটা ছাত্র বলল, তোকে অধ্যাপক ডাকছেন। তোর রোল নম্বর তো ১১৩। চলে যা। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে অধ্যাপকের কাছে গেলাম। যে প্ল্যাটফর্মের উপর উনি দাঁড়ান, সেই প্ল্যাটফর্মে উনি উঠতে বললেন এবং ইংরাজীতে বললেন আমি যা এই সময়ে পড়িয়েছি আমি তা বুঝতে পেরেছি কি না। আমি বললাম, হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। উনি বললেন, তুমি বাংলায় তা সকলকে বুঝিয়ে দাও। আমি বললাম, আমি কী করে তা করব। উনি বললেন, 'হ্যাঁ, এখন তোমাকেই তা করতে হবে এবং তুমি তা পারবে। চক নিয়ে, ডাস্টার নিয়ে দাঁড়াও। যা আছে তা বাংলাতে ব্যাখ্যা করো এবং ব্ল্যাকবোর্ডে যতটুকু প্রয়োজন তা লিখে দাও।' হঠাৎ করে অধ্যাপকের নজর আমার উপর কেন পড়ল তা বুঝতে পারলাম না। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। চক, ডাস্টার নিয়ে কিছুক্ষণ যেন সম্বিত হারিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ অধ্যাপক বললেন, 'যাও, ব্ল্যাকবোর্ডে কাজ করো।' শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের আদেশমত পড়ালাম, ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলাম। আমার সহপাঠীগণ সমস্বরে অধ্যাপককে বললেন বিষয়টি তাদের কাছে এখন সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। পরবর্তী জীবনে কলেজে অধ্যাপনা করেছি, কিন্তু ঐ অধ্যাপকের স্নেহাশীর্বাদে তার শুরু অধ্যাপক হওয়ায় শিক্ষাগত যোগ্যতাও অর্জনের পূর্বে। আমার জীবনে এ এক স্মরণীয় ঘটনা। তারপর থেকে মাঝে মাঝে তিনি আমাকে ডেকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে বলতেন এবং পড়াতে বলতেন। আমার সহপাঠীরা মনযোগ দিয়ে আমার সেই কথা শুনত। সেইসময় আমি পড়ানোয় যে আনন্দ উপভোগ করেছি, পরবর্তী জীবনে কলেজে ছাত্র পড়ানোর উৎসাহের বীজ তখনই উপ্ত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেন্দ্রের অতীত শিক্ষামন্ত্রী শীলা কল, কে সি পন্থ, নরসিমা রাও, মাধব রাও সিন্ধিয়া থেকে শুরু করে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী অর্জুন সিং এদের প্রত্যেকের নিকট হতে কখনও কখনও আমাকে মৃদু সমালোচনা শুনতে হয়েছে আমার বক্তব্য পেশের সময় বেশি পরিমাণে পরিসংখ্যান ব্যবহার করার জন্য। সম্ভবত আমার এই প্রবণতার বীজ উপ্ত হয়েছিল বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা। তার সম্পর্কে উৎসাহ তৈরী করার ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের এই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুলতান স্যারের যোগ্যতা ও দক্ষতার মধ্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অল্পের জন্য প্রথম হতে পারলাম না। দ্বিতীয় হলাম। ভর্তি হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়তে হল প্রচন্ড আর্থিক সংকটে। দু-বেলা ঢাকায় অনেক

দূর হেঁটে গিয়ে গৃহশিক্ষকতা করতাম। যেটুকু উপার্জন করতাম তাই দিয়ে যাবতীয় ব্যয়নির্বাহ করতাম। জানি, বাড়ি থেকে একটি পয়সাও দিতে পারবে না। বরং বাড়িতে সাহায্য করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ যখন প্রায় শেষ করেছি, তখন হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। গ্রেট ব্রিটেন সরকার পাকিস্তানের কিছু ছাত্রকে সেখানে পড়ার জন্য বিদেশী স্কলারশিপ দেবে। তারজন্য যোগ্যতার মাপকাঠির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড নম্বর পেয়েছেন, এমন একজন অধ্যাপক ছিলেন সাহ্দাদ উল্লাহ্। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কেন করতেন তা কোনো দিন বুঝতে পারিনি। তিনি ক্লাসে পড়াচ্ছেন, হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, আমি ঐ বিজ্ঞাপনটি দেখেছি কি না। আমি বললাম হ্যাঁ দেখেছি। উনি নির্দেশ দিলেন আমি যেন ঐ পরীক্ষায় বসার জন্য ফরম তুলি। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার নিজস্ব কোনো বই নেই, পরের বই দেখে পড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়াশুনা করি, দু'বেলা গৃহশিক্ষকতা করি। এই পরীক্ষা দিতে গেলে যে প্রস্তুতি থাকা দরকার, তা আমার নেই। উনি বললেন, 'আমার এই নির্দেশ, তোকে এই পরীক্ষায় বসতেই হবে।' মন-প্রাণ দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর এই নির্দেশ মাথা পেতে নিলাম। নিচু হয়ে বললাম, 'আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।' কিছুই হবে না, তবুও আপনি যখন আমাকে বলেছেন, আমি এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব। উনি স্মিত হাসিতে আমাকে উৎসাহিত করে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'তোর সাফল্য কামনা করি। তুই চেষ্টা কর, সফল হবি।' পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলাম। ফল প্রকাশ হলো। বিস্ময়ের সাথে খবর পেলাম আমি এতে সফল হয়েছি। আমাকে বিলেত যেতে হবে। পড়াশুনা করে ঐ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পেতে হবে। সুযোগ পেয়েছি। যখন শুনলাম তখন নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনি। এটা কী করে সম্ভব। আনুষ্ঠানিকভাবে খবর পেলাম সংবাদটা সঠিক। একান্তভাবে অনুভব করলাম অধ্যাপক সাহ্দাদ উল্লাহ্-এর মত অনুপ্রেরণাদায়ী শিক্ষক না হলে এই সাফল্য আমার পক্ষে অর্জন করা আদৌ সম্ভব হতো না। একজন শিক্ষকের প্রেরণা তাঁর ছাত্রের কাছে যে কত মহীয়ান হতে পারে, সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তা হৃদয়ঙ্গম করলাম। শুনলাম অল্পদিনের মধ্যেই বিলেতযাত্রা করতে হবে। হঠাৎ একদিন আমার সেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এবং একজন পরিপাটি পোষাকে আচ্ছাদিত ভদ্রলোক আমার কাছে এসে হাজির হলেন। সেই ভদ্রলোক একখানি কাগজ বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। বললেন, 'এই কাগজে সই করুন।' অধ্যাপক সাহ্দাদ উল্লাহ্ও বললেন, 'কপিটিতে সই করে দে।' আমি বললাম, 'কাগজে কী লেখা আছে তা না দেখে সই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' কাগজটিতে লেখা ছিল আমি বিলেত থেকে পড়াশুনা শেষ করে যখন পাকিস্তানে ফিরব, তখন পাকিস্তান-এর কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত কোনো কাজের সাথে আমি যুক্ত থাকব না। এই মর্মে কাগজে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তবেই নাকি আমি বিলেত যেতে পারব। আমি অধ্যাপককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই দাসখতে কি আমাকে সই করতে হবে?' অধ্যাপক বললেন, দেশে ফিরে কী করবে, না করবে তা পরে দেখা যাবে। আপাতত বিলেত যাওয়ার জন্য এই কাগজে সই করতে হবে। অকস্মাৎ আমার মনুষ্যত্ব, আমার বিবেক বিদ্রোহ করে বসলো। আমার হাতের কাগজটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। অন্য ভদ্রলোক আমার দিকে রোশ-কষায়িত লোচনে তাকিয়ে রইলেন। বিলেতে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার দুর্লভ সুযোগের হাতছানি, অন্যদিকে সততা — এই দুই মেরুর সংঘাতের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এক মুহূর্ত সময়ও লাগল না। আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছি, উৎসাহিত হয়েছি, তিনি কি না কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছু সময় মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে দেখলাম তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমিও বাক্য রহিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি ধরা গলায় বললেন, আমার মধ্যে দুটি প্রতিক্রিয়া। তুই অত্যন্ত গরীব বাড়ির সন্তান। পড়াশুনার কোনো সুযোগ পাওয়া তোর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে যে অকল্পনীয় সুযোগ পেয়েছিস তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিস। এর জন্য প্রচন্ড ব্যথা ও দুঃখ পেলাম। আর সেই সাথে আমার আনন্দ হচ্ছে আমার স্নেহে লালিত-পালিত হয়ে তোর এই নির্ভীক মানসিকতা, আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আমার চোখে জল এনে দিয়েছে। তোকে আশীর্বাদ করি, তোর বিলেত যাওয়া হল না বটে, কিন্তু তুই যেন এই নির্ভীক এবং আদর্শনিষ্ঠভাবে জীবনে অবিচল থাকতে পারিস।' ক্রন্দনরত অধ্যাপকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দেখলাম, 'আপনার এই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সারাটা জীবন সচেষ্ট থাকব।' আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকটিকে পরে বুঝলাম উনি পুলিসের লোক, কী একটা কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তাতে লেখা আছে আমার বিলেত যাওয়ার বৃত্তি বাতিল করা হলো। তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন।

প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত যত

শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি, মনে হয় আমি ভাগ্যবান। প্রত্যেক শিক্ষকের যথার্থ শিক্ষক-সুলভ মানসিকতা, ছাত্র-দরদী মন, কর্তব্য-নিষ্ঠা আমাকে প্রতি পলে পলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। যতটুকু লেখাপড়া শিখেছি তার পিছনে একদিকে আমার মায়ের অবদান, অন্য দিকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজের ভূমিকা। এখনও সেইসব শিক্ষকদের কথা মনে পড়লে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। বারে বারে উপলব্ধি করি মানুষ তৈরীতে শিক্ষক সমাজের ভূমিকার কোনো তুলনা নেই। যদি আমি আমার ঐ শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসতে না পারতাম, যদি তাঁদের নিকট হতে প্রেরণা লাভ করার সুযোগ না পেতাম, কণামাত্র সংশয় নেই, আমার সারাটা জীবন কাটত খেতমজুরী করে বা ঐ জাতীয় কোনো কাজ করে। উচ্চশিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষকদের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে জীবনে কখনও অন্য কোনো চাকুরীর কথা কল্পনাও করিনি — শিক্ষকতা করা ব্যতীত।

আমার শিক্ষকগণ ছিলেন আমার জীবনের ধ্রুবতারা সম। তাঁদের কেউই এখন বেঁচে নেই। আমি আমৃত্যু প্রেরণা ও শিক্ষা পাব আমার ঐ শিক্ষকদের জীবন থেকে।

ধারাবাহিক

ভিয়েতনামের অধিবাসীদের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ

(ভিয়েতনামের যুদ্ধজয়ের ৩০তম বার্ষিকী এবং হো চি মিনের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে)

বিবেক মিত্র

(লেখক একজন প্রবাসী ভারতীয় শিক্ষাবিদ্)

"ন্যায়ের সংগ্রামে ভিয়েতনামের অধিবাসীরা হচ্ছেন বিশ্বযোদ্ধা। এদের সংগ্রাম পৌরাণিক। মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষেরা কী পরিমাণ বীরত্বে সক্ষম হতে পারেন তারই শাশ্বত বাণী। আসুন ভিয়েতনামের বাসিন্দাদের আমরা সম্মান জানাই।"

— বার্ট্রাণ্ড রাসেল

সাইগনের পতনের তিরিশ বছর পূর্ণ হলো ২০০৫ সালে। যুগান্তকারী এই ঘটনার স্মৃতিচারণে আমরা সম্মান যেমন জানাচ্ছি ভিয়েতনামের সেই অধিবাসীদের যারা এটা সম্ভব করেছিলেন তেমনই পুনরুজ্জীবিত করছি তাদের সেই সংগ্রামের বহ্নিশিখাটিকে আজকের দিনের লড়াইগুলির উদ্দেশ্যে যেগুলি চলছে ইরানে, প্যালেস্টাইনে, কিউবায়, ভেনিজুয়েলায়, ব্রাজিলে, একোয়াডরে, কলম্বিয়ায়, নিকারাগুয়ায়, যুগোশ্লাভিয়ায়, ভারতবর্ষে — এক কথায় সারা পৃথিবী জুড়ে। সেই একই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যেটা আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ইন্দোচীনের মাটিতে রক্তক্ষরণ করে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিকে তুলনা করেন "অগ্নিনিবারক এক স্বেচ্ছাবাহিনীর" সঙ্গে যেটা নাকি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে চাপা আগুন নেভানোর যেমন "ইন্দোচীনে, কোরিয়ায় বা আলজিরিয়াতে 'কম্যুনিষ্ট লুঠতরাজের' আগুন" ("ভিয়েতনামে আমাদের স্বার্থ", ওয়েসলী ফিসেলের "Anatomy of a Conflict"-এ অন্তর্গত)। এই স্বেচ্ছাবাহিনীর অগ্নিনিবারকদের কীভাবে নেভাতে হয় যার যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে ভিয়েতনাম এক সময়কার মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডিকে।

ভিয়েতনামের বিজয়ে ভারতবাসীদের বিশেষ গৌরব বোধ করার কথা কেন-না ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সম্পর্ক সুপ্রাচীন (১নং মন্তব্য)। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ভিয়েতনামের সংগ্রামকে নিজেদের সংগ্রাম হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে তদানীন্তন অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদাম নুয়েন থি বিনকে তারা যে পরিমাণ সম্বর্ধনা জানান ঠিক সমপরিমাণ ধিক্কার দেন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিবকে। নগর কলকাতার মাটিতে ম্যাক্‌নামারার পদার্পণের প্রতিবাদে শহরের নাগরিকদের বিশাল সমাবেশের কথা সহজে ভুলে যাবার নয়। ভিয়েতনাম সম্পর্কে ভারত সরকার মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল যে মনোভাব (যদিও প্রারম্ভে প্রতিক্রিয়াশীল) গ্রহণ করেছিল তার পেছনে ভারতবাসীদের তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অবদান অনস্বীকার্য্য।

ভিয়েতনামের সংগ্রামের ওপর কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি সেই সংগ্রামের সর্বাগ্রগণ্য নেতার সম্বন্ধে দু-একটি কথা না বলা হয়। রাজনীতি বা মতাদর্শ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না এমন বহু মানুষও ভিয়েতনামের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন কেবল এই ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। নিজে কৃষক যিনি সারা জীবন দারিদ্র্য ও সংগ্রামের মধ্যে কাটান ; জাহাজের রাঁধুনীর থেকে ফোটোগ্রাফারের সহকারী পর্যন্ত বিবিধ পেশাবলম্বী ; দীর্ঘদিন জঙ্গলে-গুহায় বসবাসকারী ; কবিতা লেখক ; ফরাসী ; ইংরাজী, রুশ এবং চীনে ভাষায় রপ্ত ; একাধিক দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে পরিগণিত ; কমিন্টার্নের নেতৃস্থানীয় কর্মী ; একাধিকবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ; পায়ে গলায় কয়েদীর বেড়ী পরে জেলখানার বাসিন্দা ; পায়ে হেঁটে শয় শয় কিলোমিটার পরিভ্রমক ইত্যাদি এই নেতার কিছু পরিচয় দেয়। নুয়েনটাট থান (বুদ্ধিমান নুয়েন) ওরফে নুয়েন আই কুয়ক (দেশপ্রেমিক নুয়েন) ওরফে লি চুই ওরফে সুং মাঞ্চু ওরফে পি কে লিন ওরফে থুই ওরফে লিনভ্..... প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সর্বজন পরিচিত (আলোকদাতা) হো চি মিন ছিলেন কবি ভবভূতির "যত্রাদপি কঠোরাণী মৃদুনি কুসুমাদপি" সেই আদর্শ মানুষের বিংশ শতাব্দীর প্রতিমূর্তি (হো চি মিনের ওপর বোধহয় সবচাইতে ভাল আলোচনা হচ্ছে প্রাভদার সাংবাদিক ইয়েভ্‌গেণী কাভাকিয়েভের বই "হো চি মিন")।

আসছে ৩রা সেপ্টেম্বর অনন্যসাধারণ হো চি মিনের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষেই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধ।

(১) যুদ্ধ, জয় এবং পরাজয়

১৯৭৫ সালের ৩০শে এপ্রিলের কাকডাকা ভোর পাঁচটায় মার্কিন হেলিকপ্টার "লেডি ০৯" পারি দিল পূর্বাচীন সাগরের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে যাত্রী "কোড-২" পলায়নরত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত গ্রাহাম্ মার্টিন। লেডি ০৯-এর অন্তর্ধানের সঙ্গে প্রতীচ্যের সর্বপ্রধান এবং বিশ্বের মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার ক্ষুদ্র এক দেশের কৃষক বাহিনীর সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিল। ভিয়েতনামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, মাটি-জমি, গাছপালা, পশুপাখী[২] — এক কথায় স্থাবর-অস্থাবর, জীবন্ত-মৃত যা কিছুর অস্তিত্ব ছিল ভিয়েতনামের মাটির ওপর, তা সবের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করলো আমেরিকা। গোটা পদাতিক বাহিনীর ৬০শতাংশ ; বিমান বাহিনীর সমপাল্লার ৩২ এবং দূরপাল্লার ৫০শতাংশ এবং ১৮টি বিশাল জঙ্গীবিমান বহনকারী জাহাজের ১৫টিই ব্যবহার করতে হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ("আমাদের বসন্তকালের জয়" — ট্রান ভ্যাং ডাং। গিয়াপের পর ডাং ভিয়েতনামের গণবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হন এবং যুদ্ধ শেষ হয় তারই সামরিক নেতৃত্বে)। আমেরিকা ভিয়েতনামে বোমা ফেলে সর্বসাকুল্যে প্রায় ১ কোটি টন (প্রতি বর্গমাইলে ৭০টন, প্রতিটি নাগরিকের জন্য ৫০০ পাউণ্ড এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ওপর বোমাবর্ষণের ২০ গুণ)। ভিয়েতনামের মাটি-জমি, গাছপালা, বনজঙ্গল, পশুপাখী এবং জীবন্ত মানুষকে হত্যা করা হয় রাসায়নিক বিষ ছড়িয়ে (ডি ডি টি, ডায়ক্সিন এবং বিভিন্ন রঙ-এর 'এজেন্ট'), ফস্‌ফরাস এবং নাপাম বোমার দ্বারা (প্রতিটি ভিয়েতনামীর জন্য প্রায় ৭ পাউণ্ড বিষ ব্যবহার করা হয়[৩] (ট্রান ভ্যাং ডাং, পূঃ উঃ ; জোসেফ অ্যামটার — "ভিয়েতনাম সিদ্ধান্ত" এবং নোয়াম চমস্কীর "এশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ")। আণবিক যুগোপযোগী অত্যাধুনিক প্রচণ্ড শক্তিশালী অগুণতি মহাস্ত্রে সজ্জিত ২কোটি মার্কিন-অমার্কিন সেনা ঝাঁপিয়ে পড়ে এশিয়ার ক্ষুদ্র একটি দেশের ওপর আয়তন যার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগেরও কম, দীর্ঘ এক শতাব্দীর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দুঃশাসনে ভিত্তি যার শিথিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষেও বিপ্লবী বাহিনী বলতে যার ছিল মাত্র ৩৪জন লোকের একটা দল এবং অস্ত্রশস্ত্র বলতে বাঁশের বল্লম, দা-কুটুরী এবং শিকারীদের দান কিছু গাদাবন্দুক[৪] (আরও দেখুন কাভাকিয়েভ, উঃ উঃ। "এত বিপুল সংখ্যার এত বিপুল সম্ভারের সামরিক সজ্জার বিরুদ্ধে এমন ন্যূনতম সম্ভারের স্বল্পসংখ্যক মানুষের লড়াইয়ের কথা ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই। ভিয়েতনাম-আমেরিকার যুদ্ধের সঙ্গে তুলনায় ডেভিড এবং গোলায়ামের দ্বন্দ্ব প্রায় সমতুল্যের দ্বন্দ্ব" — বল্লেন অনন্যসাধারণ অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক উইলফ্রেড বার্চেট ("ভিয়েতনামের জয় সুনিশ্চিত") (বি-১)।

টমাস জেফারসন থেকে উড্রো উইলসন পর্যন্ত মার্কিন ঔপনিবেশিকদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রসঙ্গের সুরটা আবার গাইলেন আমেরিকার ৩৭তম রাষ্ট্রপতি রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সন। ভিয়েতনাম একটা "চতুর্থ শ্রেণির শক্তি"। "যুদ্ধ বা শাসনকার্য চালানোর যোগ্যতা নেই ভিয়েতনামীদের" — বল্লেন রিচার্ড নিক্সন যেমন বলেছিলেন ফ্র্যাংকলিন ডেলানো রুজভেল্ট নিক্সনের আড়াই দশক আগে। সাম্রাজ্যবাদের দাম্ভিকতায় অন্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি ঘোষণা করলেন — "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই, কোন অবস্থাতেই, জেনেভা চুক্তির দ্বারা ভিয়েতনামব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেবে না" (কেনেডি, উঃ উঃ)। তার ঠিক অব্যবহিত পূর্বতন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের কাছ থেকে কেনেডি ভালভাবেই শুনেছিলেন যে ১৯৫৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে হো চি মিনের ৮০শতাংশেরও বেশী ভোট পাওয়াটা ঠেকান দুঃসাধ্য হতো। কিন্তু কেনেডি-নিক্সনের বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও "চতুর্থ শ্রেণির শক্তি" ভিয়েতনাম চূর্ণ করলো ফরাসী ক্ষমতাকে ; বিমান আক্রমণের প্রতিরক্ষায় পৃথিবীতে দুর্ভেদ্যতম ব্যূহ রচনা করলো (স্পেন্সার টাকারের "ভিয়েতনাম" বইতে উল্লিখিত) এবং সুদীর্ঘ ৬০০মাইল রণক্ষেত্রের ১৪০টি শত্রুশিবিরে যে যুগপৎ আক্রমণ চালালো ১৯৬৮ সালের টেট্ আক্রমণে বার্চেট সেটাকে "সমর ইতিহাসে অতুলনীয় কৃতিত্ব বলে অভিনন্দন জানালেন। এখানেই শেষ নয়। "চতুর্থ শ্রেণির" এই শক্তি স্বয়ং নিক্সনকেই পরিণত করলো এমন এক "মস্তিষ্কবিকৃত" মানুষে যে উনি যুদ্ধ চালাতে লাগলেন "কোণঠাসা উপায়হীন এক ইঁদুরের মতো" — যেমন বল্লেন পল সুইকি এবং লিও হুবারম্যান ("অন্তহীন যুদ্ধ") (সু-হু)[৫]। পরিশেষে বাধ্য করলো নিক্সন-কিসিংগারকে প্যারিসের শান্তি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামের সেই চুক্তিগুলিতেই স্বাক্ষর দিতে ঠিক যেগুলিকে অতীতে দম্ভসহকারে অগ্রাহ্য করেছিল মার্কিন সরকার। আমেরিকার যুদ্ধ ক্ষমতাকে ভিয়েতনামীরা এমনই বিপর্যস্ত করে তোলে যে দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থই ক্ষীণ হয়ে যায়। লক্ষ্যণীয় যে ১৯৬৮ সালে আমেরিকার গুপ্তচরী জাহাজ পুয়েব্লোকে ধরে

নিয়ে গিয়ে যে অপমানজনক অবস্থার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফেলে উত্তর কোরীয়ানরা তার বিশেষ কোন প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেনি আমেরিকা।[৬] "খৃষ্টমাস বোমাবর্ষণ" করেও ভিয়েতনামকে নতজানু করতে সক্ষম হয় নি আমেরিকা। বিপরীতে, নারকীয় এই বোমাবর্ষণের কোনো ফল যদি আদৌ হয়েছিল তবে তা হচ্ছে এই যে এটা "নিক্সনকে আরও বাধ্য করলো আপোষ-মীমাংসায় ফিরে যেতে। উত্তর ভিয়েতনামের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল করলো আমেরিকাকে"[৭] — যেমন বল্লেন জর্জ হেরিং ("আমেরিকার দীর্ঘতম যুদ্ধ")। "চতুর্থ শ্রেণির শক্তি" ভিয়েতনামের সঙ্গে লড়াই করে আমেরিকার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে (যুদ্ধের শেষদিকে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের থেকে বেরিয়ে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং দেশের সমাজসৌধে বেশ ভালরকমের ফাটল ধরতে শুরু করে।

স্বল্প ভাষায়, ভিয়েতনামীদের সঙ্গে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় — সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং মানসিক যে কোন দিক থেকেই চূড়ান্ত পরাজয়। এমন পরিপূর্ণ পরাজয়ের কারণ, বলছেন বাষ্টেন ("পতঙ্গ ও হাতী ঃ কেন ভিয়েতনামের পতন হলো" (বি-২), ভিয়েতনামীদের "শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিকতা।"

"এটা কী করে সম্ভব" — প্রশ্ন করছেন ঐতিহাসিক প্যাটারসন — "যে কম্যুনিস্ট ভিয়েতনামীরা — সামরিক বাহিনী যাদের আমেরিকার সাতভাগের একভাগেরও কম, উচ্চমানের অস্ত্রশস্ত্র এবং জঙ্গীবিমানের যাদের অভাব, বার্তাবিনিময় এবং যানবাহন যাদের আদিম যুগের, চীন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার থেকে সাহায্য যাদের ন্যূনতম — খর্বকায় এই শত্রু কেমন করে পিছু হটাল পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক শক্তিকে ?" (W.L. Hixson-এর সম্পাদিত " The Lessons and Legacies of the Vietnam War" গ্রন্থে)। অধ্যাপক প্যাটারসনের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তা করবার বিষয়। উত্তরে যেগুলি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের অভিমত সেগুলির আলোচনার চেষ্টা করা হলো নীচে।

(২) ভিয়েতনামীদের 'সুনিশ্চিত জয়ের' ভিত্তি

(ক) সংগ্রামের লক্ষ্য এবং লক্ষ্যের অভিনব তাৎপর্য্য ঃ এটা সন্দেহাতীত যে নিজভূমি থেকে বিদেশী শত্রু এবং ঘরের বিভীষণদের বিতাড়ন করাটা ভিয়েতনামীদের কাছে ছিল সর্বপ্রধান। বিগত অন্তত দুহাজার বছর ধরে এই কাজটা করে আসছে ভিয়েতনামের অধিবাসীরা। কিন্তু কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীতে ফরাসী-মার্কিনীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভিয়েতনামের শাশ্বত-সনাতন মুক্তিসংগ্রামে এমন একটা অভিনব তাৎপর্য্য দেখা দিল অতীতে যা কখনও দেখা দেয়নি এবং দেখা দেওয়াটা সম্ভবও ছিল না। সেটা হচ্ছে এই যে ফরাসী-আমেরিকানদের তাড়িয়ে তাদের জায়গায় কোন লে, নুয়েন বা ট্রাং বংশ প্রতিষ্ঠানের অতীতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল না এবার। বিপরীতে, পরদেশী শত্রুর সঙ্গে একই সঙ্গে এই বংশগুলিরও স্থায়ীভাবে অবসানের উদ্দেশ্য ঘোষণা করল ভিয়েতমিন এবং জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। লড়াইয়ের মূল লক্ষ্যকে করা হলো বিদেশী পুঁজিপতি প্রভুদের একই সঙ্গে দেশীয় সামন্ত ও শিল্পপ্রভুদেরও উচ্ছেদ করে একেবারে জনগণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। অন্য কথায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধকে একাত্ম করা হলো সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের সঙ্গে যেটার মূলভিত্তি বর্তমান কালের সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এই সেই বিখ্যাত "জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্ন" স্বয়ং লেনিন যেটার রূপদান করেন এবং স্তালিন এবং মাও-সে-তুং যেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। সর্বপ্রথম রুশ বিপ্লবে সৃষ্ট এই লক্ষ্যপূরণের কর্মসূচিটি ভিয়েতনামীরা তাদের নিজস্ব, ভিয়েতনামের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন। সংগ্রামের অভিনব এই তাৎপর্য্য উপস্থাপিত হয়নি অতীতে ভিয়েতনামে কেন-না এটা হওয়া সম্ভব ছিল না। "ইতিহাস কেবলমাত্র সেইসব সমস্যারই উত্থাপন করতে পারে যেগুলির সমাধান বাস্তবে সম্ভব।" ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচিকে যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবেন তাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। এটাও বোঝা দুঃসাধ্য নয় যে ভিয়েতনামের যোদ্ধারা এবং নেতৃবৃন্দ অন্যান্য দেশগুলির মুক্তির সঙ্গে একাত্মতার ওপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করবেন। অন্যথায় ভিয়েতনামে জয়লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ত।[৮]

অতীব কৌতূহলের ব্যাপার যে আমেরিকানরা ফরাসীদের প্রায় বাধ্য করে ইন্দোচীনে উপনিবেশগুলি দখলে রাখার লড়াইগুলিকে "সাম্যবাদ বিরোধী" বলে প্রচার করতে। অন্যথায় আমেরিকা সাহায্য অপসারণ করার হুমকি পর্যন্ত দেয়। সাম্রাজ্যবাদের কৌতূহলোদ্দীপক এই real politik-এর ব্যাখ্যাটা দেওয়া প্রয়োজন অন্তত পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য হলেও। আমরা সবাই জানি যে "ভিয়েৎকং" শব্দটা আসলে অপমানকর শব্দ। "ভিয়েতনামী কম্যুনিষ্টের" পরিবর্তে "ভিয়েতনামী কমি।" এখন আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। মার্কিন দেশে কম্যুনিষ্ট জুজুর[৯] নামোচ্চারণ করেই "জনসাধারণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতে বা যে কোন আন্দোলনকে বদনাম দেওয়াতে অভ্যস্ত" মার্কিনী প্রভুরা — যেমন বললেন বার্ট্রান্ড রাসেল ("ভিয়েতনামে যুদ্ধাপরাধ")। পৃথিবীর অন্য দেশগুলিতে যে "কম্যুনিষ্ট" শব্দটার

সুনাম থাকতে পারে সেটা বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেল প্রভুদের এবং ফল হলো বিপরীত। "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায্যতার জন্য মানুষের লড়াইগুলিকে কম্যুনিজমের সঙ্গে একাত্ম করে অপবাদ রটাতে গিয়ে আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে কম্যুনিজমের যে সুনামটা রয়েছে সেটাকে আরও পাকাপোক্ত করে তুলল" — অপূর্ব সুন্দর বিশ্লেষণ করলেন রাসেল। উনি আরও জানলেন যে তড়িঘড়ি করে এটার প্রতিকারের জন্য USIA (বর্তমানে USIS) ভিয়েৎকংয়ের পরিবর্তে অন্য আরেকটি বদনাম উদ্ভাবনের জন্য এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করল এবং এমনকি পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করল। রাসেল আমাদের জানাচ্ছেন যে দুটি মাত্র শব্দ ধোপে টিকল — "ফরাসী" এবং "আমেরিকান"। ভিয়েতনাম বিপ্লবের অভিনব তাৎপর্য্যের এর চাইতে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে!

(খ) সামরিক অত্যুৎপন্নতা ঃ ভিয়েতনামীদের "শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিমত্তা"র কথা যেটা বলেছেন বাষ্টেন, তার মধ্যে উনি সামরিক বুদ্ধিমত্তাকে অন্তর্গত করেছেন। যুদ্ধ পরিকল্পনা, সামরিক কলাকৌশল, নিপুণতা (স্লোগান ছিল — একটি বাজুদা, একটি জঙ্গীবিমান), ঝটিতি আক্রমণ, শত্রুকে বিভ্রান্ত ও আচম্বিত করার ভিয়েতনামী সমরবাহিনী এবং সমর পরিচালকেরা যে অনেক উচ্চস্তরের ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। এ সবের জলজ্যান্ত প্রমাণ দিয়েছে পূর্ব উল্লিখিত ১৯৬৮ সালের টেট আক্রমণ। মার্কিনী এবং সাইগনীদের নিজস্ব দাবী অনুসারেই তাদের গুপ্তচরী যন্ত্রপাতি এতই উচ্চমানের ছিল (এবং এটা সঠিকও বটে) যে তাদের অজ্ঞাতে কোন ভিয়েৎকংয়ের নাকি একহাঁড়ি ভাতও সেদ্ধ করার ক্ষমতা ছিল না। অথচ উত্তরের সপ্তদশ সমান্তরাল থেকে একেবারে সর্বদক্ষিণে ফাও মাউ প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ৬০০ মাইল লম্বা রণক্ষেত্রের ১৪০টা শহরে, ১০০টি জেলা কেন্দ্রে, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি সামরিক ঘাঁটিতে এবং সর্বোপরি সাইগনের দুর্ভেদ্য এবং প্রচণ্ড সুরক্ষিত মার্কিন দূতাবাসের দোরগোড়াতেই যুদ্ধ এবং সমরবাহিনী পর্যন্ত এনে হাজির করল মুক্তিফ্রন্ট যা কাকপক্ষীতেও টের পেল না।[১০] এটা অতীব কৌতূহলজনক যে শত্রুর প্রভূত গুপ্তচরী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভিয়েতনামের গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতাও ধরা পড়েননি বা পাহাড়ে-জঙ্গলে গুপ্ত ঘাঁটিগুলির একটিও কখনও উন্মুক্ত হয়নি শত্রুর কাছে। সাইগনের পতনের অবশ্যম্ভাবিতায় আমেরিকানরা এবং থিউ সরকার শহরের রাস্তাঘাট, সংযোগ সেতুগুলি এবং প্রায় ৫০০ গুরুত্বপূর্ণ অত্যাধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসের এলাহি প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং প্রচুর গুপ্তচর মোতায়েন করে এর তদারকির জন্য। অথচ পতনের পর সাইগনকে পাওয়া যায় প্রায় পরিপূর্ণভাবে অক্ষত অবস্থায়। এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যদি মনে রাখা যায় যে সাইগনের পতন ঘটে অভূতপূর্ব দ্রুততার সঙ্গে যা এমন কি ফ্রন্টের অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে পর্যন্ত হতবাক করে।[১১] ১৯৭২ সালের "খৃষ্টমাস বোমাবর্ষণে" (৫নং মন্তব্য দেখুন) তখনকার সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী শক্তিশালী B-52 গুলির ঢেউ আসতে থাকে হ্যানয় এবং হাইফংয়ের ওপর। হেনরী কিসিংগার হুঙ্কার দেন "বোমা মেরে হ্যানয়ের দিনের আলো মুছে" দেবার। কিন্তু পররাষ্ট্র সচিব কিসিংগারের ইচ্ছা পূরণ হল না। উত্তর ভিয়েতনামের SAM-2 ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পাল্লা, বিস্ফোরক শক্তির বৃদ্ধি এবং গতিশীলভাবে মোতায়নের জন্য (এইগুলি এই ক্ষেপণাস্ত্রের রুশ উদ্ভাবকদের বিস্মিত করে দেয়) শহর দুটির ক্ষতির মাত্রা ন্যূনতম থাকে।[১২]

ভিয়েতনামে জনযুদ্ধের এ ধরনের অসংখ্য সামরিক কৃতিত্ব আজকে রূপকথার পাতায় চলে গেছে। তবুও ভিয়েতনামের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী ঔপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে সামরিক দিকটা রূপকথা তুল্য সাফল্য ও কৃতিত্ব সত্ত্বেও সবসময়েই রাখা হয়েছিল রাজনীতি এবং আদর্শগত লড়াইয়ের তত্ত্বাবধানে। এই ব্যাপারটার বাস্তব প্রয়োগ হচ্ছে ভিয়েতনামের বিপ্লবের বিখ্যাত "সশস্ত্র প্রচার বিভাগ"। এটা পূর্ব আলোচিত ভিয়েতনামের জনযুদ্ধে অভিনব তাৎপর্য্যের পুনঃপ্রতিফলন। "খর্বকায় এই শত্রু কেমন করে পিছু হটাল পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক শক্তিকে" — অধ্যাপক প্যাটারসনের প্রশ্নের মূল সমাধানটা এই জায়গাতে।

(গ) নৈতিক দিক ঃ ভিয়েতনাম বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে নৈতিকতা-ন্যায্যতা বনাম অনৈতিকতা-অন্যায্যতার এত পরিষ্কার দ্বন্দ্ব বোধহয় আর কখনও দেখা যায়নি। ভিয়েতনামীদের যুদ্ধ প্রকৃত বিচারে প্রায় পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞায় জনযুদ্ধ যাতে ভিয়েতনামের সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ — কৃষক এবং সম্ভ্রান্ত, শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবী, ধার্মিক ও অধার্মিক — সকলেই অংশগ্রহণ করেন (এমন কি জাপানীদের কবল থেকে পলায়নরত ফরাসীদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল অংশগ্রহণ করতে)। দেশ-বিদেশের মানুষের কছে এটা অজ্ঞাত ছিল না। এই যুদ্ধে নেতা ও অনুসরণকারীর মধ্যে তফাৎটা বিলুপ্ত হয়। তা ছাড়া নেতৃবৃন্দের প্রায় বেশির ভাগই ছিলেন নিজেরাই কৃষক, শ্রমিক অথবা বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী। যুদ্ধের নামে ব্যবসা ফাঁদিয়ে পয়সা আয় করার ধান্দাটা এদের ত্রিসীমানাতেও

ঘেঁষতে পারেনি। ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের অনাড়ম্বর ও স্বচ্ছ জীবনযাত্রা, মানুষের জন্য আত্মত্যাগ, রাজনীতি এবং আদর্শের মহানতা বিস্মিত করে পৃথিবীকে (এ সবের অপূর্ব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল কল্কো তার Anatomy of Peace বইটিতে। এ ধরনের যুদ্ধে B-52 বা Thunder chief জঙ্গী বিমান অস্ত্র হিসেবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিপরীতে তুলনায় চরিত্রহীনতা ও অনৈতিকতা বিরোধীপক্ষকে জনসমক্ষে নামিয়ে দেয় অধমতম স্তরে। লোভ, ক্ষমতা, সুবিধাবাদ এবং লুণ্ঠনের জন্য কম্পিউটারের সংখ্যাতত্ত্ব এবং নরহত্যার সংখ্যাবৃদ্ধির পৈশাচিকতার ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধের নমে গণহত্যা ; মাটি ও মানুষের ওপর নারকীয় ধ্বংসলীলা ; সর্বোপরি, বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষায়, "পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবিদ্বেষ" এদের নিম্নতম অপরাধীতে সাব্যস্ত করে। জন কেনেডি একবার তুলনা করেন আমেরিকার কর্মকান্ডকে "ঈশ্বরের কর্মকান্ড"র সঙ্গে এবং সহোদর ভ্রাতা রবার্ট কেনেডি "পৃথিবীতে আমেরিকার নৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকারের" কথা বলেন (লোরেন বারিজের 'ঈশ্বরের দেশ এবং আমেরিকান কারিগরী জ্ঞান"-এ উদ্ধৃত)। কোন আচরণে বলেননি রাসেল যে "অবশেষে পৃথিবীর মানুষের মনে প্রচন্ড আঘাত হানতে সক্ষম হল আমেরিকা।"

(ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে ভাঙচুর ঃ এটা সর্বজনবিদিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুরো ভিয়েতনাম যুদ্ধটা চালায় বেআইনিভাবে। এর অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় দেশের সাধারণ মানুষের মনে। অনৈতিক, অন্যায্য এবং বিশ্বনিন্দিত একটা যুদ্ধকে দেশের নাগরিকদের কাছে এক মহান আদর্শের জন্য লড়াই বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াসে পেন্টাগনের কর্মকর্তা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্যদের অনর্গল অসত্য বক্তব্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করে "জয় হাতের মুঠোয়", "শত্রুর প্রায় নাভিঃশ্বাস উঠেছে", ইত্যাদি অবাস্তব কথাবার্তার ফুলঝুড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে তিক্ত ও বিভ্রান্ত করে তোলে। এগুলির ওপরেও যুদ্ধের ফলে আর্থিক অবস্থার অবনতি, সর্বোপরি অসাধারণ লোকক্ষয়[৩] এবং বিশ্বজোড়া মার্কিন বিরোধিতা — একত্রে মিলে আমেরিকার সমাজে ভালরকমের ফাটল সৃষ্টি করে। সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তর থেকে আসে যুদ্ধ-বিরোধিতা। রাসেলের কথা ব্যবহার করে বলা যায় যে অবশেষে সফল হল তার নিজস্ব "মানুষের মনে প্রচন্ড আঘাত হানতে সক্ষম হল।" অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে দেশ শাসন করাটাই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল এবং পেন্টাগনের সেনাধ্যক্ষদের পক্ষে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করাটা দুরূহ হয়ে পড়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে "খৃষ্টমাস বোমাবর্ষণের" পরেও কেন নিক্সন-কিসিংগাররা তড়িঘড়ি করে স্বাক্ষর দিলেন প্যারিসের শান্তি চুক্তিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে যে ভাঙচুর এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা অন্যতম একটা কারণ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর চূড়ান্ত পরাজয়ের এবং ভিয়েতনামীদের বিজয়ের।

মন্তব্য ঃ (১) ১৯২ খৃষ্টাব্দে পরাক্রান্ত ভারতীয়রা ইন্দোচীনে আসেন তাদের শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে যে নৌবহরকে অনেক ঐতিহাসিক এমনকি প্রাচীন কার্থেজের নৌবহরের সঙ্গে তুলনা করেন। মধ্য ভিয়েতনামের চম্পা রাজ্যটি ছিল এদেরই অবদান। চম্পার সম্পদশালী রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুর (বর্তমানে দানাংন শহরের সংলগ্ন হুই আন্)। প্রেকোর বলে অখ্যাত এক গ্রাম থেকে বিশাল নগরীতে পরিণত হওয়ার সাইগনি ইতিহাস সুতানুটি থেকে কলকাতায় উদ্ভাবনের সমান্তরাল।

(২) এটা অত্যুক্তি নয়। মার্কিন জঙ্গীবিমান গরু, মহিষ এবং হাতীর দলের ওপরও বোমাবর্ষণ করে এই আশঙ্কায় যে এদের পিঠের ওপর চাপিয়ে অস্ত্রশস্ত্র পাচার করা হচ্ছে। এরকম কয়েকটি আক্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন হাওয়ার্ড থিন তার "Vietnam : The Logic of Withdrawal" বইতেই। ইরাকে এবং আফগানিস্তানে হুবহু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

(৩) ১৯৬১ সালে কেনেডি বিষ ছড়ানোর Operation Hades চালু করেন। পরবর্তীকালে এটা নারকীয় হত্যাযজ্ঞ Operation Ranch Hand-এ উন্নীত হয়। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর বিষাক্ত এবং অণু-পরমাণুর ব্যবহারের বিস্তৃত বর্ণনা এবং তীব্র আক্রমণ পাওয়া যাবে বার্ট্রান্ড রাসেলের অনবদ্য ছোট বই "ভিয়েতনামে যুদ্ধপরাধ"।

(৪) সর্বপ্রথম ব্রিগেড তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ইন্দোচীন পার্টির ১৯৪১ সালের মে মাসের অধিবেশনে। পরে ১৯৪৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর নেওয়া হয় সশস্ত্র প্রচার ব্রিগেড তৈরীর। এই ব্রিগেড যেটা শুরু হয় মাত্র ৩৪ জনের একটা দল নিয়ে পরে গিয়ে দাঁড়ায় মুক্তিসংগ্রামের গণবাহিনীতে গিয়াপের নেতৃত্বে।

(৫) ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে হ্যানয় এবং হাইফংয়ের ওপর B-52 গুলি ১২দিনব্যাপী বিরামহীনভাবে বোমা ফেলে। একমাত্র হ্যানয়ের ওপরই বোমা ফেলা হয় ৪০,০০০ টন এবং হাইফংয়ের ওপর ১৫,০০০ টন। এটার নাম হচ্ছে "খৃষ্টমাস বোমাবর্ষণ"। সামরিক নাম Linebacker-II. হ্যানয়ের বাখমাই বলে বিখ্যাত হাসপাতালকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে হিরোসিমাতে যে আণবিক বোমাটা ফেলা হয় তাও হাসপাতালের ওপর। লেখক স্বচক্ষে বিধ্বস্ত এই হাসপাতালটি দেখেছেন। Linebacker-II পৃথিবীতে ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং দুনিয়ার সমস্ত জায়গাতে (এমন কি আমেরিকার মিত্র দেশগুলিতে পর্যন্ত) প্রচন্ডভাবে নিন্দা করা হয়। সুইডেনের ওলোফ পামার এর তীব্র নিন্দা ও আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুইডেন থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে আনে। Nixon গোপনে আরেকটা সামরিক অভিযান চালায় যেটার নাম হচ্ছে Linebacker-I. এটা চালান হয় লাওস-কম্বোডিয়াতে বিখ্যাত হো চি মিন অলী ধ্বংস করার জন্য। ছোট্ট দেশ লাওসের কেবলমাত্র একটি অংশে বোমা পড়ে, সর্বসাকুল্যে (১৯১৫-৭৩) প্রায় ৩০ লক্ষ টন।

(৬) সপ্তম নৌবহরের Constellation কেবলমাত্র নাম-কে-ওয়াস্তে কোরীয়ান পেনিনসুলায় টুঁ মেরেই চলে যায়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রতিরক্ষা কী রকম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেটার সামরিক তথ্য দিয়েছেন বাষ্টেন (বি-১ দেখুন)।

(৭) রয়টারের এক রিপোর্ট অনুসারে (বি-২তে উদ্ধৃত) উত্তর ভিয়েতনামীরা B-52গুলিকে এমনহারে ফেলতে থাকে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর Strategic Air Command-এর তিন মাসের মধ্যে সমস্ত জঙ্গীবিমান শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আরও তথ্যের জন্য দেখুন পৃঃ উঃ জোসেফ অ্যামটার।

(৮) কেবল ভিয়েতনামেই নয়, ভিয়েৎমিন এবং জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট একাত্মতা স্থাপন করে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে (সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও অন্তর্ভুক্ত)। কেন্দ্র-পরিধি ইত্যাদি নব্য মার্কসবাদী পজিটিভিষ্ট কোনো ব্যাপারই নয়। কেন্দ্র এবং পরিধি উভয়েরই সকল মানুষের প্রগতির আন্দোলনগুলির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা — এই ছিল ভিয়েতনামের সার্বজনীনতা। ১৯৩৫ সালে কমিন্টার্নের সপ্তম অধিবেশনে (নব্য মার্কসবাদীদের ভাষায়) কেন্দ্র ও পরিধির উভয়েরই মানুষের একত্র হবার সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ ভিয়েতনাম বিপ্লব পালন করে প্রায় আক্ষরিকভাবে। এমনকি ফন্‌তেনব্লুর ব্যর্থ অধিবেশনের আপোষ আলোচনাতে সময় নষ্ট হচ্ছে জেনেও হো চি মিন অনেক সময় কাটান ফ্রান্সে কেবল ফরাসী শ্রমিকদের এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের সমর্থনের আশায়।

৯) "সাম্যবাদ বিরোধিতা অনন্যভাবে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই রোগ" — বলেন মার্টিন লুথার কিং।

১০) হুবহু একই জিনিস ঘটেছিল দিয়েন্ বিয়েন্ ফুর যুদ্ধেও। সেখানেও অস্ত্রশস্ত্র, অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম, এমনকি পরিখা পর্যন্ত খনন করা হয়েছিল দিয়েন্ বিয়েন্ ফুর দুর্গের প্রায় ৩০০ গজের মধ্যে, শত্রুর সম্পূর্ণ অজ্ঞানতায়।

১১) এই ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দিচ্ছে যে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ছিল আক্ষরিকভাবে জনযুদ্ধ তাতে ভিয়েতনামের অধিবাসীরা সমবেত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভিয়েতনামের মানুষ যদি একত্রিত হয়ে ভিয়েৎমিন এবং জাতীয় ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতা না করতেন তবে এসব অসাধ্যকে সাধন এবং অসম্ভবকে সম্ভব করাও চিন্তামাত্র অলীক কল্পনা এবং বাতুলতার বেশি কিছু হতে পারে না। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের শ্রমিক সংগঠনের নেতা ভ্যান্ তাম্-এর সঙ্গে তার দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট লিখেছেন বার্চেট (বি-২ দেখুন)। এই সাক্ষাৎকার থেকে আমরা বিস্তৃত বর্ণনা পেলাম কেমন করে কারখানার শ্রমিক, অন্যান্য লোকজন এবং এমনকি কারখানাগুলিতে (মোতায়েন পুলিস এবং গুপ্তচরেরা পর্যন্ত স্বয়ং যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল এগুলি ধ্বংস করার) এগিয়ে আসেন মুক্তিবাহিনীর লোকেদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজগুলি বন্ধ করবার জন্য।

১২) উপরোক্ত সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানলাম যে, ভিয়েতনামী গণিতজ্ঞ টা কোয়াং বু, তাঁর বিজ্ঞানের ছাত্ররা এবং গবেষকরা এগুলির পরিকল্পনা এবং হিসেব-নিকেশ করেন। অধ্যাপক বু শান্তি চুক্তিগুলির টেকনিক্যাল বিষয়গুলি বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেছেন। ভিয়েতনামের যুদ্ধের শেষের দিকে অসামান্য ডকুমেন্টারি ছবি "Hearts and Minds", তৈরি করা হয় আমেরিকাতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ওপর। এই প্রযোজনটি কিছুদিন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আমেরিকাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র প্রেক্ষাগৃহ গুলিতে এই অসামান্য ছবিটি দেখান হতো। ছবিটিতে 'খৃষ্টমাসের বোমাবর্ষণে'র B-52-গুলিকে লক্ষ্য করে হ্যানয়ের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর SAM-২ ক্ষেপণাস্ত্রগুলির অবিশ্রান্ত ক্ষেপণের এক দৃশ্য ছিল। লেখকের মনে আছে যে এই দৃশ্যটা আসবার সঙ্গে সঙ্গে কানায় কানায় ভর্তি প্রেক্ষাগৃহের দর্শকেরা দাঁড়িয়ে উঠে তুমুল করধ্বনি দিতেন।

১৩) মার্কিন সৈন্য নিহত হয় প্রায় ৬০,০০০ এবং আহতের সংখ্যা ৩০৭,০০০-এর বেশি। এছাড়া হাজারে হাজারে চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যান এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত নানান ধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এসবের ওপরও অগুণতি যুদ্ধ-ফেরৎ সৈন্যরা নিজেদেরই ছড়ান বিষ এবং ক্ষতিকারক জীবাণু যুদ্ধের শিকার হন। যুদ্ধে আমেরিকার প্রায় ৬০০০ জঙ্গীবিমান বিধ্বস্ত হয়, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৪,০০০ কোটি টাকা। যুদ্ধ চালাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয় আনুমানিক (বর্তমানের ডলারে) ৩০০০,০০০ কোটি টাকা।

(চলবে)

ভিয়েতনাম যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

বিবেক মিত্র

(লেখক একজন প্রবাসী ভারতীয় শিক্ষাবিদ্)

'সমুদ্রের ক্ষুধার্ত ঘোড়া' ভিয়েতনাম তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে 'প্রশান্ত মহাসাগরের বারান্দা' উপাধিটি লাভ করেছে। আসলে এটি ইন্দো-চীনের একটি অংশ। বার্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, টনকিন (উত্তর ভিয়েতনাম), আন্নাম (ভিয়েতনামের কেন্দ্রস্থলের উচ্চভূমি যা চীনা ভাষায় 'প্রশান্ত দক্ষিণ' নামে পরিচিত) এবং কোচিন-চায়নার (দক্ষিণ ভিয়েতনাম) সামগ্রিক রূপই ছিল ইন্দো-চীন। 'কোচিন-চায়না' নামটি আবার এসেছে পর্তুগীজ 'কাউচি চীনা' থেকে — 'কাউচি' হলো 'গিয়াও চি'র অপভ্রংশ। মনে করা হয় রোম সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস প্রেরিত বণিক গুপ্তচররা এখানেই ১৬৬ খ্রিষ্টাব্দে অবতরণ করেছিলেন (সূত্র ঃ এস সি টাকারের 'ভিয়েতনাম')। বর্তমানের ইন্দো-চীন আসলে ফরাসীদের সৃষ্ট যার মধ্যে কেবল রয়েছে লাওস, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম। মিশনারিদের 'রক্ষা'র নামে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দেই ফরাসী-তরী দক্ষিণ ভিয়েতনামের জলপথে দ্রুততার সঙ্গে ঢুকে পড়ে। ইন্দো-চীনে উপনিবেশ স্থাপনের (১৮৫০) পরিকল্পনা ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের (দ্বিতীয়) সর্বময় কর্তা তৃতীয় নেপোলিয়ানের (বোনাপার্টের ভাইপো)। সেই পরিকল্পনা ১৮৯০ সালের মধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হয় এবং ফরাসীরা ইন্দো-চীনকে পুরোপুরি গ্রাস করে। এর পরবর্তীকালের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা হলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দিয়েন থিয়েন ফু ঃ প্রথম ইন্দো-চীন যুদ্ধ

১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে বসল ভার্সাই শান্তি সম্মেলন। ১৯১৯ সালের ২৯শে জুন হো চি মিন ফরাসী প্রতিনিধি জুল ক্যামবনের কাছে পেশ করলেন 'আন্নামির জনগণের দাবীর তালিকা' যার ভিত্তি ছিল জনপ্রিয় উড্রো উইলসনের উপনিবেশ ও পরাধীন রাষ্ট্রের জনগণের অধিকার বিষয়ক ১৪দফা দাবী। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চীন, ভারত, ইজিপ্ট এবং আরব দেশগুলির প্রতিনিধিরাও। বলা বাহুল্য, তালিকাটি সামগ্রিকভাবেই উপেক্ষিত হলো।

২) ব্রাসেল্‌সে মিলিত হলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগের সদস্যগণ। হো চি মিন এলেন, এলেন মাদাম সান ইয়াৎ সেন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জওহরলাল নেহেরু, রোমা রোঁলা, হেনরি বার্বুজ এবং আরও অনেকে।

৩) হো চি মিন প্রতিষ্ঠা করলেন ইন্দো-চাইনীজ কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩০-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি, হংকং-এর ফুটবল স্টেডিয়ামে। যুক্তফ্রন্ট যত অগ্রসর হয়েছে নামও বদলেছে সেই অনুসারে। তবে এর অবসান হয় ১৯৪৫ সালে।

৪) ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য গঠিত লীগের (মে, ১৯৪১) নাম হলো ভিয়েতনাম ডক ল্যাপ ডঙ মিন (ভিয়েতমিন)। এই নামকরণটি হয় অষ্টম প্লেনামে — প্যাক বো জঙ্গলের মধ্যস্থিত একটি গুপ্ত বাঁশের কুটীরে। ১৯৪১ সালে প্রথম সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়।

৫) ১৯৪৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর তৈরি হলো স্বাধীনতার জন্য প্রচার বাহিনী — উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং সশস্ত্র সংগ্রাম। এর শুরুতে ছিল কোন আঁদ্যিকালের অস্ত্রশস্ত্র সহ ৩৪জনের একটা প্লেটুন ভ ন গুয়েন গিয়াপের নেতৃত্বে।

৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পতন ঘটল ফ্রান্সের ভি চি সরকার এবং (ইন্দো-চীনের) জাপানের। হলো অগাস্ট বিপ্লব। ভিয়েতমিন সরকারের সমর্থনে বাও দাই পদত্যাগ করলেন। হো চি মিন তুলে ধরলেন ভিয়েতনাম গণপ্রজাতন্ত্র (DRV) গঠনের মাধ্যমে 'ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণা'। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হ্যানয় শহরের বাদিন স্কোয়ারে বিশাল জনসমাবেশে ৮ঘন্টা কাজের সময় সুনিশ্চিত হলো। শ্রমজীবীর অধিকারের নিরাপত্তা, কৃষকের ভূমিকর ২৫% কমলো। দেশময় প্রতিষ্ঠিত হলো ৭০,০০০ সাক্ষরতা কেন্দ্র।

৭) ইন্দো-চীন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ডি আর ভি হো সেন্টেনী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। উত্তরে চিয়াং কাইশেক-এর সৈন্যদলকে অপসারণের জন্য ১৫,০০০ ফরাসী এবং ১০,০০০ ডি আর ভি বাহিনী প্রেরিত হলো।

৮) ফরাসীরা এই চুক্তি অমান্য করে হ্যানয় এবং হাইফং-এ বোমাবর্ষণ করলো এবং কোচিন-চীনকে একটি ফরাসী উপনিবেশ হিসেবে ঘোষণা করলো। ১৯৪৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ডি আর ভি প্রতিনিধি ফ্যাম ভ্যান ডং-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের ফন্টেনব্লু শহরে ফরাসীদের সঙ্গে ডি আর ভি

প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফরাসীদের ঔপনিবেশিক নীতির কারণে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলো না। ব্রিটিশ জেনারেল ডগলাস গ্রেসি ফরাসীদের ভিয়েতমিন ধ্বংসলীলার সাহায্যার্থে ফ্যাসিবাদী জাপানী সৈন্যবাহিনীকে মুক্তি দিলেন।

৯) ১৯৪৭ সালের বসন্তকাল। ভিয়েতমিন নেতৃত্ব ভিয়েত ব্যাক পর্বতের জঙ্গলে আশ্রয় নেয় ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর।

১০) ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো চীনের জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

১১) ১৯৫০ সালে পি আর সি এবং USSR ডি আর ভি-কে স্বীকৃতি দেয়।

১২) দীর্ঘ ন'বছর প্রতিরোধের পর অবশেষে দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হলো। ৫৫দিন যুদ্ধের পর ১৯৫৪ সালের ৭ই মে দুর্গের পতন ঘটলো। ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হলো। ফরাসীদের যুদ্ধব্যয়ের ৮০শতাংশই বহন করেছিল আমেরিকা। যারা আবার দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে সম্ভাব্য প্রয়োগের জন্য তিনটি শক্তিশালী পারমাণবিক বোমাও নিয়ে এসেছিল।

১৩) ১৯৫৪ সালের ২০শে জুলাই জেনেভা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। 17th parallel অনুযায়ী ভিয়েতনাম সাময়িকভাবে উত্তর এবং দক্ষিণ এই দু'ভাগে বিভক্ত হলো। ১৯৫৬ সালের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে স্থির হলো। চুক্তিগুলির যথাযথ প্রয়োগের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য কানাডা, পোল্যান্ড এবং ভারতকে নিয়ে গঠিত আই সি সি প্রতিষ্ঠিত হলো। আমেরিকা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলো কিন্তু এর বিরোধিতা না করার প্রতিশ্রুতি দিল। ডালাস ৮ সদস্যবিশিষ্ট SEATO তৈরী করলেন যাতে প্রেসিডেন্ট এশিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স এই তিনটিই ছিল এশিয়ার দেশ। এবার শুরু হলো আমেরিকার যুদ্ধ।

দিয়েন বিয়েন ফু থেকে ১৯৭৩ ঃ দ্বিতীয় ইন্দো-চীন যুদ্ধ

১৪) ১৯৫৫ সালের ২৬শে অক্টোবর আমেরিকার পুতুল ন দিন দিয়েম তৈরী করলো ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র (RVN) দক্ষিণে সাইগনকে রাজধানী করে। আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স RVNকে স্বীকৃতি দিল। দিয়েম নির্বাচন করতে অস্বীকার করলেন।

১৫) দিয়েম সরকার এবং তার পরিবারের অকথ্য অত্যাচার চলল। আইনের ১০/৫৯ নং ধারায় ফ্রান্স-বিরোধী যোদ্ধাদের 'কমিউনিস্ট বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিয়ে, বিশেষত যাঁরা দিয়েম সরকার বিরোধী, তাঁদের মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলো। হাজার হাজার মানুষের ওপর চলল গ্রেপ্তার, খুন, অত্যাচার ইত্যাদি। বহনযোগ্য গিলোটিন, নারীদেহের গোপন অঙ্গে আঘাত, মৃতের ছিন্ন মুন্ডু এবং অস্ত্রের প্রদর্শন, কাঁটাতারে ঘেরা বন্দীশিবির যার নাম 'Strategic hamlets', গ্রামাঞ্চলে ধ্বংসলীলা, হোয়া হাও এবং কাও দাই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নির্বিচারে হত্যা — এসব কাজের জন্যে আইজেনহাওয়ার এবং জনসন-এর মুখে দিয়েমের ভূয়সী প্রশংসা এমনকি কেনেডির পারিবারিক বন্ধু হিসেবে পরিগণিত।

১৬) ১৯৫৬ সালে ডি আর ভি (DRV) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম ইস্পাত কারখানা তৈরী করলো।

১৭) ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬০ — NLF বা দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি বাহিনী তৈরী হলো তে নি প্রদেশের জঙ্গলে। ভিয়েতকং-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড।

১৮) ১লা নভেম্বর, ১৯৬৩ — দিয়েম এবং তার ভাই ন্যু নিহত হলো সি আই এ'র ষড়যন্ত্রে। নানা ঘটনা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছল ন গুয়েন ভ্যান থিউ এবং ন গুয়েন কাও কি'র শাসন ব্যবস্থায় ১৯৬৫ সালে।

১৯) কেনেডির নেতৃত্বে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী গঠিত হলো। অপারেশন হেডেস (Operation Hades) থেকে কেনেডি শুরু করলেন যা পরবর্তীকালে রূপ নিল অপারেশন র‍্যাঁ হ্যাণ্ড (Operation Ranch Hand)-এ। ভিয়েতনামের প্রাকৃতিক।

কেনেডি খুন হলেন ১৯৬৪ সালে। 'শান্তির প্রতিনিধি' লিণ্ডন জনসন ক্ষমতায় এলেন। শুরু হলো অপারেশন ব্যারেল রোল (Operation Barrel Roll)। ৩ মিলিয়ন টন বোমা লাওস-এ ফেলা হল (৬৪-৭৩)। আমেরিকান জলসেনা উত্তর ভিয়েতনামের উপকূল অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করার সাথে সাথে অপারেশন পিয়ার্স এ্যারো (Operation Pierce Arrow) শুরু হলো।

(২০) 'টনকিন উপসাগরে'র জঘন্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (৭ই আগস্ট, ১৯৬৪) জনসন যুদ্ধ ত্বরান্বিত করলেন, উপলক্ষ ছিল DRV টর্পেডো তরীর আমেরিকান ম্যাডক্স এবং টার্নার জয় নামক ডেসট্রয়ারের উপর তথাকথিত আক্রমণ (ম্যাডক্সের ক্যাপ্টেন কর্তৃক সমর্থিত তথ্য নয়)। শুরু হলো 'অপারেশন রোলিং থান্ডার' (Operation Rolling Thunder) (৬৫-

৬৮)। উত্তরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ। ইন্দো-চীনে ৮ মিলিয়ন টন বোমা ফেলা হলো। সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে পরিমাণ বোমা বর্ষিত হয় তার দ্বিগুণ। ভিয়েতনাম আমেরিকাকে এমন স্বতঃস্ফূর্ত জবাব দিল যে তাদের কাছে সে হয়ে উঠল 'হ্যানয়কেন্দ্রিক নরক বিশেষ'। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে DRV তৈরী করতে সমর্থ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন নিরাপদ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা এককথায় বিস্ময়কর।

(২১) NLF এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক শান্তিকামী শক্তিরা জোট তৈরী করল দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রাদেশিক বিপ্লবী সরকার।

(২২) মাই লাই ম্যাসাকার — বর্বর আমেরিকান সৈন্য নির্মমভাবে হত্যা করল ২০০-৫০০ অসামরিক ব্যক্তিকে।

(২৩) সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৬৯ — হ্যানয়ে মারা গেলেন হো চি মিন।

(২৪) দুর্বল শক্তি নিয়ে আমেরিকান সেনা গেল প্যারিসে। পারস্পরিক শত্রুতার অবসান ঘটাতে হ্যারিম্যান এবং থো একমত হলেন চারদলের একটি সম্মেলন আহ্বান করতে। DRV দাবী করল ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর শর্তহীন অপসারণ। আলোচনা ভেস্তে গেল, জনসন সরে গেলেন, মঞ্চে এলেন নিক্সন। তিনি এবং কিসিঙ্গার ভিয়েতনামের সামরিক তৎপরতাকে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গেলেন।

(২৫) ১৮ই মার্চ, ১৯৭০ — কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধান নর্ডম সিহান্যু গদিচ্যুত হলেন আমেরিকার মদতপুষ্ট LON NOI দ্বারা।

(২৬) ১৯৭০-৭১ — নিক্সন শুরু করলেন তাঁর গোপন Linebacker I, উত্তর ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওসের উপর প্রচন্ড বোমাবর্ষণ। উদ্দেশ্য জনপ্রিয় Ho Chi Minh Trail। ১৫৫,৫৪৮ টন বোমা পড়ল শুধু উত্তর ভিয়েতনামে। ব্যবহৃত হলো স্মার্ট বম্ব, লেসার নির্দেশিত বম্ব এবং EOGB। নিক্সনের গোপন যুদ্ধনীতি প্রকাশ্যে এসে গেল। খোদ আমেরিকাতেই ঝড় উঠল প্রতিবাদের।

(২৭) ১৯৭২— থিউ-এর সঙ্গে সঙ্গেই নিক্সন-কিসিঙ্গার সমস্ত শান্তি প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিলেন। ২৩শে মার্চ প্যারিসের সমঝোতা বৈঠকও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখলেন এবং তাঁদের ফ্যাসিস্ট সেনাবাহিনী সমস্ত রকম কৌশলই অবলম্বন করল। NLF এবং DRV (30th March) এযাবৎ কালের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাত্রার প্রতিরোধ গড়ল — 17th Parallel-এর দক্ষিণের সমস্ত ঘাঁটি দখল করে কেন্দ্রীয় উচ্চভূমির ও লাওস-কম্বোডিয়া সীমান্তের ঘাঁটিগুলি কেড়ে নিয়ে। ১৯৭২-এর জুলাই মাসে আবার শুরু হলো প্যারিসের শান্তি আলোচনা কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই আমেরিকার অকারণ বাধাসৃষ্টির ফলে তা ব্যর্থও হলো।

(২৮) ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭৩—DRVকে নিক্সন শেষ কথা বললেন। কিসিঙ্গার বীভৎস বোমাবর্ষণের শপথ নিলেন। হ্যানয় এবং হাইফঙে লাইন্যাকার II অথবা 'ক্রিসমাস বম্বিং' শুরু হলো। হ্যানয়ে পড়ল ৪০,০০০ টন বম্ব এবং হাইফঙে ১৫,০০০ টন। লক্ষ্য ছিল বিদ্যালয় এবং হাসপাতালগুলি। হ্যানয়ের সুপরিচিত বীচ মাই চিকিৎসালয় ধ্বংস হলো। B-52 বিমানগুলি দ্রুত ধ্বংস হতে লাগল এবং বহু মার্কিন পাইলট ধরা পড়ল। অবশেষে জেনেভা চুক্তি এবং ১৯৬৮ সালের বৈঠক অনুসারী ভিয়েতনাম প্রস্তাবিত শর্তগুলি মেনে নিতে কিসিঙ্গার প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করলেন।

(২৯) জানুয়ারী ২৭, ১৯৭৩ — বিদেশমন্ত্রী ন গুয়েন দুই তৃণ (DRV) এবং মাদাম ন গুয়েন থি বিন (PRG) স্বাক্ষর করল শান্তি চুক্তি।

(৩০) ১৯শে মার্চ, ১৯৭৩ — প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হলো লা সেল স্ট্রিট-এ (Cloud Talks)।

(৩১) মার্কিনীরা ফেলে এল হাজার হাজার তথাকথিত অসামরিক উপদেষ্টা শ্রমিক, যারা আসলে সেনাবাহিনী এবং CIA'র চর। তাদের মদতপুষ্ট থিউ-এর সৈন্যবাহিনী PRG নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক তান্ডব চালাল। অভিযোগ জানাল DRV।

(৩২) ৫-৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩— আলজিয়ার্সের বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি আলোচনায় বসল। স্থায়ী সদস্য হিসেবে PRG স্বীকৃত হলো।

(৩৩) ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ — থিউ প্যারিস চুক্তি সত্ত্বেও সাধারণ নির্বাচন বা রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিলেন।

১৯৭৩-১৯৭৫ ঃ তৃতীয় ইন্দো-চীন যুদ্ধ এবং অপারেশন হো চি মিন

(৩৪) ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৪ — সায়গন এক তরফাভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্যারিস আলোচনা বন্ধ করে দিল।

(৩৫) ২৩শে জুন, ১৯৭৪ — PRG দুই পক্ষবিশিষ্ট যুক্ত সামরিক কমিশন এবং চার পক্ষবিশিষ্ট যুক্ত সামরিক দল

থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। International Commission of Control and Supervision (ICCS) যা কানাডা, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও ইন্দোনেশিয়া নিয়ে গঠিত, নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

(৩৬) মার্চ ২৫, ১৯৭৫ — পলিটব্যুরো সায়গন রাজত্বের অবলুপ্তির উদ্দেশ্যে অপারেশন হো চি মিন ঘোষণা করলেন। অনেক নাটকীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ঘাঁটি থেকে সায়গন সেনাকে বিতাড়িত করল ভিয়েতনাম পিপ্‌লস আর্মি (VPA), PRG সৈন্যরাও যাঁদের মধ্যে ছিলেন।

(৩৭) ২১শে এপ্রিল, ১৯৭৫—আমেরিকার অসহযোগিতার কারণে থিউ পদত্যাগ করলেন। তিনি এবং কলোন-চাইনিজ সঙ্গীরা তাইওয়ানে চলে গেলেন। বহির্গমনের প্রচেষ্টারত বিশ্বাসঘাতকেরা উত্তেজনার বলি হয়ে পদপিষ্ট হলো।

(৩৮) ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৫ — VPA সায়গন আক্রমণ করল এবং অধিকার করল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত গ্রাহাম মার্টিন পালিয়ে গেল এবং ৩০ বর্ষব্যাপী ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হলো।

(৩৯) ২রা জুলাই, ১৯৭৫ — আনুষ্ঠানিকভাবে দুই ভিয়েতনাম এক হলো Socialistic Republic of Vietnam নামে। তার রাজধানী হ্যানয় এবং প্রধানমন্ত্রী ফ্যাম ভ্যান দঙ। সায়গনের নতুন নাম হলো হো চি মিন।

উইলফ্রেড বার্স্টেটের ভাষায় (Grasshopers and Elephants : Why Vietnam Fell) –জনগণের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং ৩০ বছরব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যেক পর্যায়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণই ভিয়েতনাম যুদ্ধকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

ভিয়েতনামীদের যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে আমেরিকান যুদ্ধবাজরা শান্তির সব দরজা বন্ধ করে মানুষকে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে সমাধানের নামে।

এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি একটি প্রতিবিপ্লবী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং অত্যাচারী শক্তি, যা বিশ্বজুড়ে সমস্যা সৃষ্টি করছে। যেখানেই মানুষ ক্ষুধার্ত ও শোষিত সেখানেই তাঁরা নিপীড়িত এবং অপমানিত — এই শয়তানের দূতেরা অবশ্যই মানুষের সেই দুর্দশার পেছনে রয়েছে। জায়গাটি হতে পারে কঙ্গোর মবুতু অথবা ব্রাজিলের ব্র্যাঙ্কো, হতে পারে দক্ষিণ কোরিয়ার পাক, থাইল্যান্ডের থ্যানম, ন গো দিন দিয়েম বা কাওকি — সবখানেই নিহত মানুষের বুকে বিঁধে রয়েছে যে ছোঁরা তার হাতলে আমেরিকার ছাপ রয়েছে।

অনুবাদক ঃ সোনালী দত্ত ও দেবিকা বসু

‘শিক্ষা ও সাহিত্য’-র ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ‘ভাষা সংখ্যা’ হিসাবে প্রকাশিত হবে। যথাসময়ে লেখা পাঠান। অনুগ্রহ করে একাদেমির বানান বিধি মেনে লিখবেন, ফুলস্কেপ কাগজের শুধু একদিকে লিখবেন, জেরক্স কপি পাঠাবেন না। বিদ্যালয় ইউনিটে নিয়মিত যৌথভাবে পত্রিকা পাঠ করুন। ভালমন্দ কিছু বক্তব্য থাকলে ‘পাঠকের কলমে’ অংশের জন্য লিখে পাঠান। পাঠকের প্রতিক্রিয়া ব্যতিরেকে পত্রিকার মানোন্নয়ন যথাযথ হয় না।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

ধাপে ধাপে ভারতবর্ষের বুকে যুদ্ধঘাঁটি গড়ার মার্কিন চক্রান্ত

সত্য সাউ

ভারত-মার্কিন সহযোগিতার অঙ্গ হিসাবে দু'দেশের যৌথ বিমান বাহিনীর মহড়া "একসারসাইজ কোপ" ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুন্ডা সামরিক বিমান ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২টি F-16 বিমানসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। সঙ্গত কারণেই দেশের বামপন্থীসহ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যানুসারে নগর-শহর-গ্রামাঞ্চলে এই যৌথ বিমান মহড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত ভারতবর্ষের বুকে ভারত-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়া এটা প্রথম নয়। এটা ১৯৯২ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও ১৯৯২-এর জানুয়ারীতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সহযোগিতা দিয়ে এটা শুরু করেছিলেন। এরপর বাজপেয়ী-আদবানীর মার্কিন প্রেম আরও উথলে ওঠে এবং ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে দিল্লীর স্ট্র্যাটেজিক সহযোগিতা স্ট্র্যাটেজিক আঁতাতে পরিণত হয়। ভারতের স্বাভাবিক মিত্র হয় ওয়াশিংটন। ভারতবর্ষের জনগণের অভিজ্ঞতায় 'ওয়াশিংটনের স্বাভাবিক মিত্রতা' একটা ভন্ডামি। স্বাভাবিকভাবে দেশের জনগণ বাজপেয়ী সরকারের খুনী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশ বিক্রির চক্রান্ত মেনে নেয়নি। গত লোকসভা নির্বাচনে জনগণ মার্কিন-বিশ্বায়ন নীতির উগ্র সমর্থক বাজপেয়ী সরকারকে দিল্লীর মসনদ থেকে হটিয়ে দেয়।

> গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে অভিজ্ঞতা এটাই, প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ সামরিক বিমান মহড়া, তারপর সামরিক বিমানঘাঁটি, শেষে মার্কিন সামরিক সেনাঘাঁটি, ধাপে ধাপে এইভাবেই তৈরী হয়েছে। এখন পৃথিবীর ১২০টি দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে।
>
> দেশহিতৈষী, ৪ঠা নভেম্বর

বামপন্থী ও অন্যান্য বি জে পি-বিরোধী (সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী) আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় দলগুলির সমর্থনে দিল্লীর মসনদে আসীন হন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি মেনে চলার অঙ্গীকার করে এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বাজপেয়ী সরকারের মার্কিন-আত্মসমর্পণ নীতি পরিত্যাগ করার তাঁরা অঙ্গীকার করে। তবুও ভারতবর্ষের রাহুমুক্তি ঘটলো না। World Bank-এর পূর্বতন আমলা এবং ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাজপেয়ী জামানায় মার্কিন-মিত্রতায় যতটুকু ফাঁকফোকর ছিল সেগুলি সিমেন্টিং করতে শুরু করেন। বুশ-মনমোহন ঘোষণা করেন "ভারত-মার্কিন সম্পর্কে এত ঘনিষ্ঠতা কখনও হয়নি।"

"ভারত-মার্কিন সম্পর্কে এত ঘনিষ্ঠতার" নমুনা হলো, ২৪শে সেপ্টেম্বর International Atomic Energy (IAEA)-র ইউ পি এ সরকার ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতিকে পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক মিত্র ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে নির্লজ্জভাবে ভোটদান করে। ভোটাভুটিতে রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। একমাত্র ভেনেজুয়েলা মার্কিন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলির সাথে হাত মিলিয়ে মার্কিন প্রস্তাব সমর্থন করে। অথচ প্রতিবেশী পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা মার্কিন প্রস্তাবে ভোট না দিয়ে রাশিয়া-চীন সহ অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে একাত্ম ছিল। ফলে দুনিয়ার চোখে কলঙ্কিত হয়েছে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতির ভাবমূর্তি।

১৯৯২ সালে নরসীমা রাও জামানায় ভারত-মার্কিন স্থল সেনাদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও ছোট ছোট মহড়ার লক্ষ্যে গঠিত হয় ভারত-মার্কিন Army Executive-Steering Committee. এরপর সেবছরই দুদেশের নৌ-বাহিনীর যৌথ নৌ-মহড়া শুরু হয় এবং গঠিত হয় Naval Force Joint Steering Committee. ১৯৯৪ সালে অনুরূপ উদ্দেশ্যে দুদেশের বায়ুসেনার মধ্যে গঠিত হয় Air Force Joint Steering Committee.

১৯৯৫ সালে ভারত-মার্কিন সহযোগিতা চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় সেনাদের অত্যাধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য মার্কিন মুলুকে পাঠানোও শুরু হয়। হালফিল ২০০৬ সালের ৯ই জানুয়ারী থেকে ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত মার্কিন মুলুকে হাতেকলমে পাঠ নিতে

দেশের পুলিশ ও আধা-সামরিক একদল অধিকর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে। ৯ই সেপ্টেম্বরের জঙ্গী হামলার অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার কার্যকরী পদ্ধতি মার্কিনীরা তাদের ক্লাসে ভারতীয় পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর মার্কিন সফরের সময় বিষয়টি পাকা করা হয়েছিল। যদিও বলা হচ্ছে এই পাঠক্রমে মূলত নাশকতার অনুসন্ধান, টাস্কফোর্স গঠন এবং সন্ত্রাসবাদী অপরাধের প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরীর বিষয়টি থাকবে। সাথে সাথে যেটা অনুচ্চারিত রয়েছে, তা হলো এই সুযোগকে ব্যবহার করে ভারতীয় সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর পদস্থ কর্তাদের মধ্যে কট্টর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী মার্কিন লবি তৈরী করা যারা দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে মার্কিন-স্বার্থকে রক্ষা করবে এবং কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী তথা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের উপর অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হবে। বিশ্ব ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে।

বাজপেয়ী সরকার দিল্লীর গদিতে আসীন হয়েই দক্ষিণ-এশিয়ায় মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জুনিয়ার পার্টনার হিসাবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপরতা শুরু করে। এমনকি আফগানিস্তানে মার্কিনীরা নিজেদের সৃষ্ট আলকায়দা ও তালিবানদের বিরুদ্ধে যখন সামরিক অভিযান শুরু করে, তখন দিল্লী আগ বাড়িয়ে ভারতীয় নৌবন্দর ও বিমানবন্দর ব্যবহার করার জন্য মার্কিন বাহিনীকে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বুশ সরকার এ ব্যাপারে তাদের দীর্ঘদিনের স্বাভাবিক মিত্র পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দেয়। তবু দিল্লী হাল ছাড়েনি। বাজপেয়ী সরকারের বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিং মার্কিন সহকারী বিদেশসচিব স্ট্রোব ট্যালবেটের সঙ্গে বেশ কয়েকটি গোপন বৈঠকও করেন। তারই ফলশ্রুতিতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI-কে রাজধানী দিল্লীতে শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। দেশে দেশে সামরিক ক্যুদেতা বিশারদ কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA'র সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার দফারফা ঘটিয়ে সরকার প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার চাহিদামতো যে কোন তথ্য তারা যেন সরবরাহ করে।

২০০২ সালের মে মাসে আগ্রায় ছয়দিনের জন্য এবং ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে কাশ্মীরের লাদাখে তিনসপ্তাহ ধরে ভারত-মার্কিন যৌথ সামরিক বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ভারতীয় বায়ুসেনারা আলাস্কায় যায়। ২০০৪-এর ফেব্রুয়ারীতে টানা ১২ দিন যৌথ বায়ুসেনা মহড়া চলে গোয়ালিয়রে। আমাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট্ট রাজ্য মিজোরামে মার্কিন সেনারা জঙ্গল যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়।

বাজপেয়ী সরকার মলাক্কা প্রণালী বরাবর মার্কিন রণতরী পাহাড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে আগ বাড়িয়ে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজগুলিকে নিয়োগ করতে রাজী হয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে ভাগ করে ইরাকের তেল লুণ্ঠনের স্বার্থে ইরাকে সেনা পাঠাতে চেয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। ভারতীয় জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়ে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

ভারতীয় জনগণ কংগ্রেস-পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের নিকট আশা করেছিল, তারা নেহেরু-ইন্দিরা ঘরানার ঐতিহ্যমন্ডিত জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে চলবে এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রণী প্রতিনিধি হিসাবে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। বিশ্বে ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগের অবসানের পরবর্তী বিশ্বকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসী লগ্নীপুঁজির বিশ্বায়নকে হাতিয়ার করে শক্তির একমেরুকরণের বিশ্বে পরিণত করতে চাইছে। কংগ্রেস পার্টির শ্রেণিগত অবস্থান থেকে বাজপেয়ী সরকারের মত বিশ্বলুণ্ঠনে ওয়াশিংটনের জুনিয়র পার্টনার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইউ পি এ সরকারের মধ্যে অতি দ্রুত সংক্রামিত। তারই ফলশ্রুতিতে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর রুটিন সফরের ঝুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে "ভারত-মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের" নতুন চুক্তি। এরপরই মার্কিন সফরে এসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের এক দীর্ঘ বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে বুশ-সিং যৌথ বিবৃতিতে বলেন, এই বৈঠক হলো "সহযোগিতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের নতুন যুগের সূচনা"।

দিল্লীতে কংগ্রেস-পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়ার পর পরই ২০০৪-এর অক্টোবরে কেরালার কোচি উপকূলে আরব সাগরের উপর ৫ দিন ধরে চলে ভারত-মার্কিন যৌথ নৌ-মহড়া—"মালাবার-০৪"।

বর্তমানে দু'দেশের সামরিক সম্পর্ক জোরদার করতে নানা সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। চলেছে যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ ও যৌথ মহড়া। সাথে সাথে মার্কিন বৃহৎ অস্ত্রকোম্পানীগুলি নেমে পড়েছে ভারতবর্ষে অস্ত্র সামরিক বিমান ও অস্ত্র সরঞ্জাম বিক্রির আসরে। ৭ই নভেম্বর থেকে কলাইকুন্ডায় ১২ দিনের ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়া

তারই ফলশ্রুতি। মার্কিন লকহিড কোম্পানী এই যৌথ মহড়ার ফলে ১২৬টি F-16 বিমানের অর্ডার পেতে চলেছে ভারত সরকারের নিকট থেকে। ওয়াশিংটনের ফাঁদ হলো একদিকে ভারতবর্ষকে তার বিশ্ব সামরিক স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারে পরিণত করা এবং অন্যদিকে ভারতকে তাদের অস্ত্রের বৃহৎ বাজারে পরিণত করা।

ভারতবর্ষের জনগণ চায় না ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগামীদিনে মুখ থুবড়ে পড়ুক। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে অভিজ্ঞতা এটাই,—প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে সামরিক বিমান মহড়া, তারপর সামরিক বিমানঘাঁটি, শেষে মার্কিন সামরিক সেনাঘাঁটি। এইভাবে ধাপে ধাপে ১২০টি দেশে সেনাঘাঁটি তৈরী করেছে ইয়াঙ্কিরা।

মার্কিন সেনাবাহিনী হিটলারের নাজি বাহিনীর মতো সবচেয়ে ঘৃণিত সশস্ত্র বাহিনী। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক সহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে তারা নৃশংস আক্রমণ শানিয়েছে। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ করতে তারা অত্যন্ত পটু। মার্কিন সেনাদের বর্বর হত্যালীলা এখনও ইরাকে বন্ধ হয়নি। ইরাকী বন্দীদের অমানবিক দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন নিত্যদিনের ঘটনা। ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনার পর সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা, গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সাইনবোর্ডের আড়ালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাপী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের শক্তিশালী সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করছে। ভারতবর্ষের জনগণ চায় না ভারত এই আগ্রাসী দখলদারি মার্কিন রাজনৈতিক ও সামরিক রণনীতির শরিক হোক।

লাতিন আমেরিকায় মার্কিন-প্যারাগুয়ে যৌথ সামরিক মহড়া প্রসঙ্গে আর্জেন্টিনার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যক্তিত্ব অ্যাডলফো পেরেজ এসকুইভেল মন্তব্য করেছেন : "কে না জানে, মার্কিন সেনা একবার কোন দেশে পা রাখলে, সরতে সময় নেয় বহুদিন।"

যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে আসা অথবা বিভিন্ন মার্কিন মিত্র (তাঁবেদার) দেশে মোতায়েন হওয়া ইয়াঙ্কি সেনাদের দুষ্কৃতীমূলক অপকান্ডের কালো তালিকা দীর্ঘ। গণধর্ষণ, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজ তারা বুক চিতিয়ে করে। ওয়াশিংটনের কূটচুক্তির জালে জড়িয়ে পড়া দেশগুলি তাদের দেশীয় আইনানুসারে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দোষী মার্কিন সেনাদের শাস্তি বিধান করতে পারে না।

২০০৫-এর নভেম্বর মাসের প্রথম দিনেই ম্যানিলার কাছে মার্কিন নৌ-সেনাদের সাবেক ঘাঁটিতেই যৌথ মহড়ায় আসা ৬ জন মেরিন সেনা ফিলিপাইনসের এক তরুণীকে ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানেও মার্কিন সেনারা এমন বহু কুকীর্তি ঘটিয়েছে। স্বভাবতই ফিলিপাইনস জনগণ দাবী তুলেছে এই মুহূর্তে মার্কিন সেনাদের ফিলিপাইনসের মাটি ত্যাগ করতে হবে। "শুরু হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উত্তাল আন্দোলন।

ওয়াশিংটনকে রুখতে চীন-রাশিয়ার নয়া যৌথ উদ্যোগ

এদিকে ওয়াশিংটনকে রুখতে নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক সংকটকালের স্বাভাবিক মিত্র রাশিয়া (যদিও লেনিন-স্টালিনের রাশিয়া এখন নেই) ও প্রাচীনকালের ঐতিহ্যবাহী বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন। স্বাভাবিকভাবে একমাত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বের একমেরুকরণীয় রণনীতি রুখতে রাশিয়া ও চীন যে নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাতে ভারত সামিল হওয়ার দাবী তুলেছে ভারতবর্ষের বামপন্থীরা। ২০০৫-এর ৩০শে জুন মস্কোয় সরকারী সফরে আসেন চীনের রাষ্ট্রপতি হু জিনতাও। চীনের রাষ্ট্রপতির মস্কো সফরশেষে জুলাই-এর গোড়ায় চীন ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে একবিংশ শতকে বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে এক যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এই ঘোষণাপত্রে মার্কিন নেতৃত্বে শক্তির একমেরুবিশ্ব গড়ার প্রক্রিয়াকে ওয়াশিংটনের নাম উল্লেখ না করে, পরোক্ষভাবে কঠোর নিন্দা করে বহুত্ববাদী বা বহুমেরুকরণীয় বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চীন ও রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হয়। রাশিয়া-চীন যৌথ ঘোষণাপত্রে বিরোধ ও জোটকেন্দ্রিক মানসিকতা এবং বিশ্বের দেশগুলিকে সর্দার তার অনুচরদের মধ্যে ভাগ করার উদ্যোগকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ঐ ঘোষণাপত্রে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়াগুলিকে উপেক্ষা করে তাদের উপর ভিনদেশী ছাঁচে গড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগকে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

একুশ শতকের নতুন বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে চীন-রাশিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলা হয়—একুশ শতকের বহুত্ববাদী নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এবং কাঁটা-বিছানো-পথে, যথেষ্ট বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেই। যতদিন পর্যন্ত সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সর্বজনের

গৃহীত আন্তর্জাতিক আইনের রীতিনীতির ভিত্তিতে এক ন্যায়-পরায়ণ ও যৌক্তিকতায় সমৃদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, ততদিন সকল দেশের সমান নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়েই বিশ্বে এক নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

চীন-রাশিয়া যৌথ ঘোষণার পরই ঘোষণা অনুসারে দুটি দেশ নতুন রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রম শুরু করেছে। ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই মূলত চীন, রাশিয়া সহ মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান ও তাজিকিস্তানকে নিয়ে গঠিত হয়েছে "সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন্ বা S.C.O। S.C.O'র বৈঠক থেকে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। ঘোষণাপত্রটি বর্তমানে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হয়ে ওঠার কারণে মধ্য এশিয়া থেকে মার্কিন ফৌজ সরানোর সময়সীমা স্থির করার দাবী করেছে। আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালাতে মার্কিন ফৌজ উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তানে সামরিক ঘাঁটি বানায়। S.C.O' র দাবীর প্রধান লক্ষ্য ছিল উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তানের মার্কিন সেনাঘাঁটি সরানোর। উজবেকিস্তান সরকার আগামী ছয়মাসের মধ্যে মার্কিন সেনাঘাঁটি গুটিয়ে নিয়ে মার্কিন ফৌজকে সে দেশ থেকে চলে যেতে বলেছে। এরফলে মধ্য এশিয়ায় হাতে রইলো মাত্র একটি সামারিক ঘাঁটি অর্থাৎ কিরগিজস্তানের সামরিক ঘাঁটি। গত মার্চে মার্কিনীরা রাশিয়াপন্থী কিরগিজ প্রেসিডেন্ট আসকর আকিয়েভকে ধর্মীয় মৌলবাদীদের গণ-বিক্ষোভের মধ্যদিয়ে গদী থেকে হটিয়ে নিজেদের মনপসন্দ ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়েছে।

গত কয়েক বছরে জর্জিয়া, ইউক্রেন, কিরগিজস্তান সহ মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে এবং লাতিন আমেরিকায় ঘটে যাওয়া মার্কিনপন্থী অভ্যুত্থানগুলির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—প্রতিটি অভ্যুত্থানেই সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ সহ সরকারী ভবনগুলিতে ব্যাপক অবরোধ গড়ে তুলে কর্পোরেট সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে টক্কর নিনাদের মধ্যদিয়ে অবাধ্য (?) রাষ্ট্রপ্রধানদের বাধ্য করা গদী থেকে নেমে আসতে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে মার্কিনপন্থী এই সকল অভ্যুত্থানের মুখ্য ভূমিকা পালন করে কট্টর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী ধর্মীয় মৌলবাদীরা। তবুও কিরগিজস্তানের অভ্যুত্থানসৃষ্ট সরকার দেশের জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান চাপের মুখে বলতে বাধ্য হয়েছে যে আফগানিস্তানের অবস্থা ক্রমে স্বাভাবিক হলে মার্কিনীদের সেখান থেকে সেনাঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মধ্য এশিয়ায় সংকটে পড়ে যাওয়া বুশ প্রশাসন এখন কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে তেল ও গ্যাস পাইপ লাইন পাহারা দেবার অছিলায় S.C.O' র সদস্য নয় এমন দেশ তুর্কমেনিস্তানে সামরিক ঘাঁটি গড়ার ধান্দায় রয়েছে। তবে রাশিয়া ও চীন S.C.O' কে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে ইরান, পাকিস্তান ও ভারতকে S.C.O' তে দর্শক সদস্য করা হয়েছে।

একটা নতুন দিক হলো, এর কাজকর্মকে রাজনৈতিক পরিধি ছাড়িয়ে সামরিক পরিধিতে আনার চেষ্টা। আজ বহুমেরুর বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের একমেরুকরণীয় সামরিক উৎকর্ষতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক যৌথ ন্যায়সঙ্গত সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২০০৫-এর আগস্ট মাসে এক সপ্তাহ ধরে "Peace Mission-2005" নামে এক বড় মাপের চীন-রুশ যৌথ সামরিক মহড়া রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তক থেকে শুরু হয়ে পরেরদিন পীত সাগরে পূর্বচীনের শ্যানডঙ উপদ্বীপে সরে আসে। মহড়ার বিষয় ছিল, রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে রুশ ও চীনা বাহিনী একটি দেশে ভয়ঙ্কর জাতিদাঙ্গা থামাতে সেখানে অবতরণ করেছে। এই মহড়া চলাকালীন ৯ হাজারের মতো চীনা সৈন্য এবং ১৮শ রাশিয়ান ফৌজ বিদ্রোহীদের দখল নেওয়া এক উপকূল রেখার উপর আকাশ থেকে এক নকল আক্রমণে অংশ নেয়। এই নকল আক্রমণের সময় দূরপাল্লার বোমারু জঙ্গী বিমানগুলি থেকে সমুদ্র উপকূলে শত্রুপক্ষের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় এবং রণতরী ও ডুবোজাহাজ নিয়ে শত্রুপক্ষের একটা ডুবোজাহাজকে অনুসরণ করে ধ্বংস করা হয়। আগস্ট মাসে এক সপ্তাহ ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে চলা সামরিক মহড়ায় রাশিয়া ও চীন ছাড়া S.C.O'র চার সদস্যদেশ কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানকেও দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

মুখে 'এক চীন নীতির' প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেও ইয়াঙ্কিদের সুকৌশলে তাইওয়ানকে সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে উস্কানি দানের নীতি এবং মধ্য এশিয়ার তেলভাণ্ডারের ওপর দখলদারি কায়েম রাখতে সারা অঞ্চল জুড়ে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে টাটকা দাওয়াই হলো 'Peace Mission 2005'। যদিও আক্ষরিক অর্থে এই মহড়ার লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা ও বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে সামর্থ অর্জন। কে না জানে সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা ও

বিভেদপন্থার আঁতুড় ঘর হলো ওয়াশিংটন।

মহড়ায় পারমাণবিক আক্রমণে ব্যবহারের উপযোগী ক্রুইজ মিসাইল সজ্জিত 'টি ইউ-২২এম' ও 'টি ইউ-৯৫' নামে দূরপাল্লার রুশ বোমারু বিমানগুলির ব্যবহার প্রশান্ত মহাসাগরীয় মহড়ায় এক বিশেষ সামরিক মাত্রা এনে দেয়।

মার্কিন-বুশ কোম্পানীর চক্ষু ছানাবড়া। ভবিষ্যতে 'Peace Mission-2005'-এর চেয়েও বড় ধরনের সামরিক মহড়া সংঘটিত করার সুস্পষ্ট আভাস মিলেছে চীন-রুশ যৌথ ঘোষণায়। তাছাড়া চীন ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে S.C.O' র সদস্য দেশগুলিকে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে বলা হবে। মধ্য এশিয়ায় মার্কিন আধিপত্য রোধে চীন ও রাশিয়ার নেতৃত্বে সমস্ত দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস সফল হতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে S.C.O' র সদস্যদেশ রূপে ভারতও আমন্ত্রিত হবে। এটাই দেখার বিষয়, ভারত সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে না তার আধিপত্যবাদের বিপক্ষে ?

ভারতবর্ষের বুকে ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়া বা সামরিক মহড়ার বিরুদ্ধে জনগণের যে উত্তাল আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই আন্দোলনকে সারা বিশ্বে মার্কিন-আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল করতে হবে এবং মার্কিন একমেরুকরণীয় নীতির বিরুদ্ধে চীন-রাশিয়ার রণনীতিতে ভারত সরকারকে সামিল হতে হবে। এটাই ভারতীয় জনগণের আশু দাবী। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণ চায় না তাঁর মাতৃভূমি নিজস্ব স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিসর্জন দিয়ে আধিপত্যবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক হোক। স্বাধীনতার উত্তরকালের ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্যবাহী স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ও স্বাধীন অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক নীতি মেনে চলুক। তবেই আমাদের মাতৃভূমির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশপ্রেমিক ভারতবাসী হিসাবে আমরা এটাই চাই।

তথ্যসূত্র ঃ দেশহিতৈষী (সাপ্তাহিক পত্রিকা), গণশক্তি (দৈনিক পত্রিকা), আনন্দবাজার পত্রিকা, মার্কসবাদী পথ, স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ।

বই এবং বইমেলা ঃ অগ্রগতির সোপান

অসিতকুমার ভৌমিক
সহ-প্রধান শিক্ষক, উযুমপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, *উত্তর ২৪ পরগণা*

বাংলার বইপ্রেমী মানুষের কাছে শীতের হিমেল হাওয়া বয়ে নিয়ে আসে নতুন নতুন বই-এর উষ্ণতা অনুভবের আনন্দ। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষ বুধবার থেকে ১২ দিনের কলকাতা বইমেলার গুরুত্ব প্রসঙ্গে ঐ অনুভবের আনন্দকে স্বীকার করতেই হয়। এই বইমেলা তো আসলে মেলা বই-এর সমাবেশে বই বিকিকিনি ও চেনাচিনির যেমন ক্ষেত্রস্থল, তেমনি বাংলার উন্নততর সংস্কৃতির পরিচায়কও বটে। লেখকরা এই উপলক্ষে অনেক আগের থেকে নতুন বই লেখায় যেমন মগ্ন হন, তেমনি পাঠকরাও নতুন বই-এর সাথে পরিচয়ের এই লগ্নটির জন্য সাগ্রহে দিন গুণতে থাকেন। লেখক-পাঠকের মাঝে অবস্থান করেন প্রকাশকগণ, যাঁরা এই দু'-এর সংযোগ সাধনের সাথে সাথে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। বলা-বাহুল্য, যাকে কেন্দ্র করে লেখক-পাঠক-প্রকাশকের এই ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটে, সেটি হল বই। এই বই নিয়েই বইমেলায় চলে হৈ চৈ। আর বইমেলা মানে আজ কেবল কলকাতা বইমেলা নয় ; এই প্রধান বইমেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে-পরে সারা রাজ্যের ছোটো-বড়ো নানা শহর ও শহরগুলিতে অনুষ্ঠিত হয় প্রায় চারশ' পঞ্চাশটির মতো নানা আয়তনের বইমেলা। বলা যেতে পারে, আমাদের বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ এইসব বইমেলা। বিগত দু'দশকে এই বইমেলার ক্রমপ্রসার ও জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, দূরদর্শন বা হালের ওয়েবসাইট—কোনোটাই বই-এর বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি ; অর্থাৎ কোনোভাবেই বইপিপাসু বাঙালিমনকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তাই গর্বভরে বলা যায়, মানুষের মনে বই-এর দুর্নিবার আকর্ষণ এখনও অপ্রতিরোধ্য।

বই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ম্যাক্সিম গোর্কির একটি উক্তি—'বই হল মনুষ্যসৃষ্ট সব বিস্ময়ের ঊর্ধ্বে এক মহত্তম বিস্ময়'। মহামতি লেনিনের মতে এই মহাবিস্ময়কর সম্পদটির রয়েছে 'এক অসাধারণ শক্তি'। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই মহাশক্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ব-আলোড়ন সৃষ্টিকারী চার্লস ডারউইনের 'অরিজিন অফ্ স্পেসিস্ গ্রন্থে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম এবং যোগ্যতমের টিঁকে থাকার তত্ত্ব মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে এনেছে দিগন্তপ্রসারী পরিবর্তন। কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রটি হয়েছে আলোড়িত। সমাজের শোষণ মূলত পুঁজি, মুনাফা ও মজুরির স্বরূপ বর্ণনায় বিশ্বমানবের মুক্তির পথটি হয়ে উঠেছে আলোক-উদ্ভাসিত। বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধনের মধ্যদিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত বিপ্লবীদের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে এই 'দাস ক্যাপিটাল' আজও অদ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকায় রয়েছে। বিপ্লবীদের সংগ্রাম কথায়, সংগ্রামের পথনির্দেশনায় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসটিও বিশ্বসাহিত্যে এক অনবদ্য সংযোজন। বিশ্বের সকল সংগ্রামী মানুষের মনে অনুপ্রেরণাদানে, সচেতনতা সৃষ্টিতে এই বইটির গুরুত্ব সম্যকরূপে বিদ্যমান। এই ধরনের আরও একটি বই হ্যারিয়েট বিচার স্টোয়ির লেখা 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন,' যা আমেরিকার দাসপ্রথার বিরুদ্ধে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই বইটির সোনালী ফ্রেমে আজও বাঁধা রয়েছে একটি জাতি ও যুগের ছবি। এছাড়া রুশো, ভল্‌তেয়ার টমাস পেইন, লেনিন নজরুল, সুকান্ত প্রমুখ লেখকদের গ্রন্থসমূহ মানুষের শোষণমুক্তির সংগ্রামে আজও প্রেরণা দিয়ে চলেছে।

সমাজ পরিবর্তনে এবং সমাজের অগ্রগমনে বই যেমন গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে মানুষকে সঠিক পথের নিশানা দেখায়, তেমনি মানবসভ্যতার ধ্বংসসাধনে সুচেতনাসম্পন্ন মানুষকে বিপথগামী করে তোলার ক্ষেত্রে কোনো কোনো বই যে ঘৃণ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তার নিকৃষ্টতম উদাহরণ হল অ্যাডলফ হিটলারের লেখা 'মেইন ক্যাম্প'। নাৎসি জার্মানিতে এই গ্রন্থটিকে জার্মান জাতির 'বাইবেল' হিসেবে তুলে ধরার জন্য ৫০ লক্ষ কপি ওখানকার যুবসমাজের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা উদ্রেককারী এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশুদ্ধতার মহিমা প্রচারের পাশাপাশি ইহুদি সহ অন্য সকল জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল। হিটলারের ক্ষমতায় আসার আগে লিখিত ও প্রকাশিত এই 'মেইন ক্যাম্প' গ্রন্থটির ভয়ঙ্করত্বের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনায় পরবর্তী সময়ের এক গ্রন্থকার বলেছেন, 'এর প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১২৫ জন, প্রতিটি পৃষ্ঠার জন্য ৪,৭০০ জন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য ১২ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে।'

বস্তুত মানবসমাজের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক অমন নির্মম ভূমিকা পালনকারী গ্রন্থের জুড়ি সারাবিশ্বে আজও দুর্লভ। এটি সুখের কথা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে, মানববিদ্বেষী তথা কমিউনিজম-বিদ্বেষীদের মনকে আজও বিষাক্তভাবে প্রভাবিত করে চলেছে ঐ 'মেইন ক্যাম্প' গ্রন্থের বিকৃত তথ্যসমূহের আদলে গড়ে ওঠা সভ্যতাবিনাশী ধ্যান-ধারণা। সাম্প্রদায়িকতার পূজারী স্বৈরাচারী শক্তির দূষিত মগজে এখনও রয়েছে হিটলারি মানসিকতা, তাদের চোখের সামনে আজও জ্বল জ্বল করছে 'মেইন ক্যাম্প'-এর প্রতিটি অক্ষর। তারই দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের দেশের হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকাকালীন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রবিষ্ট পাঠ্যপুস্তকসমূহে। মগজদূষণের এই প্রক্রিয়া আমাদের রাজ্যে অসম্ভব হলেও দেশের কোনো কোনো রাজ্যে এখনও তা বহাল রয়েছে।

মোটের উপর, কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া বই যে মানুষের মানবসভ্যতার অগ্রগতির সোপান, এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই। বিশেষ করে, মানুষের চেতনা জাগরণে, মুক্তির সংগ্রামে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণে যেমন, তেমনি কৌতূহল নিরসনে, ক্লান্তি-অবসাদ দূরীকরণে, অভিজ্ঞতা অর্জনে এবং সর্বোপরি জ্ঞান আহরণে ও শিক্ষাগ্রহণে বই-এর বহুমুখী ভূমিকার কোনো বিকল্প আজও আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের আগ্রাসী উপস্থিতি সত্ত্বেও বই-এর চাহিদা কিন্তু কমছে না। আসলে বই পড়ার আনন্দ বা তৃপ্তি, তা 'ই-বুক' থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। বই-এর মাধ্যমে মানুষের মনোবল বাড়ে বলেই মানুষ সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারে। এক্ষেত্রে বই শাণিত যুদ্ধাস্ত্রের কাজ করে। এই ভাবনা থেকেই ব্রেখ্‌ট বলেছিলেন, 'ভুখা মানুষ বই ধরো, ওটা হাতিয়ার'। এই প্রসঙ্গে বলি, বই-এর প্রকারভেদ আছে। আমরা যে ধরনের বই-এর কথা বলছি, তা মানুষকে আনন্দ দেওয়ার উপযোগী যেমন, তেমনি তা মুক্তির স্বাদ এনে দিতেও সক্ষম। আমরা বলছি প্রগতিশীল মানসিকতা তৈরির উপযোগী পুস্তকসমূহের কথা। তাই বই পড়ার আগে কোন্ বই পড়ব, তা নির্বাচনের বিষয়টিও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সাহিত্যিক শংকর-এর একটি সুচিন্তিত বক্তব্য ঃ 'সবরকম বই আছে—ভাল বই, খারাপ বই, টাট্‌কা বই, পচা বই, স্বাস্থ্যকর বই, বিষাক্ত বই। কোনো বই মানুষকে নামায়, আবার কোনো বই উঁচুতে তোলে। বই হল সেই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের নিষিদ্ধ পল্লির রিক্‌সাওয়ালার মতন। মানুষকে খারাপ জায়গায় নিয়ে যায়—এই অভিযোগ করায় সে বলেছিল, বাবু আমি নিমিত্তমাত্র। যে মন্দিরে যেতে চায়, তাকে মন্দিরে নিয়ে যাই, যে অন্য কোথাও যেতে চায় তাকে অন্যত্র নিয়ে যাই। আসলে যে যেখানে পৌঁছাতে চায় তাকে সেখানে পৌঁছে দেওয়াটাই বই ও রিক্‌সাওয়ালার কাজ'।

মনে রাখতে হবে, বই ভুখা মানুষের হাতিয়ার, শোষণমুক্তির গণসঙ্গীত বা জাগরণের মহামন্ত্র বলে এর অমিত শক্তি শাসক ও শোষকশ্রেণির বুকে বারে বারে ত্রাসের কাঁপন সৃষ্টি করেছে। ফলে বই-এর কণ্ঠরোধ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে মৌলবাদী ধর্মান্ধ ও স্বৈরাচারী শক্তির পৈশাচিক আক্রমণ। আগুনের সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখায় একের পর এক গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ওরা পালন করেছে বীভৎস বহ্ন্যুৎসব। ইতিহাসেই আছে, সুদূর অতীতে দেশের নালন্দা-বিক্রমশীলায় বিখ্যাত গ্রন্থাগারসমূহ এবং দেশের বাইরে আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ, সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারগুলি ঐ ধরনের বহ্ন্যুৎসবে ধ্বংসীভূত হয়েছে। আর গত শতকে তিরিশ-চল্লিশের দশকে নাৎসি-নায়ক হিটলার এবং ফ্যাসিস্ত নায়ক মুসোলিনীর বই পোড়ানোর ভয়ঙ্কর নির্দেশ ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। এইসব দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত মৌলবাদী ধর্মান্ধ আর এস এস তথা বি জে পি-র অন্তরঙ্গ সহচর, এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কলঙ্ক তৃণমূল কংগ্রেসের বীরপুঙ্গবদের আগুনে ১৯৯৮-এর ৩১শে অক্টোবর ভস্মীভূত হয়েছিল খানাকুলের বলপাই পাঠাগার এবং ২০০১-এর ৩০শে জুলাই হাওড়ার গড়চুমুকের লেনিন লাইব্রেরি। ওদের রোষানলে ২০০২-এর ৫ই ডিসেম্বর কলকাতার আনন্দমোহন কলেজের লাইব্রেরিও রেহাই পায়নি। আসলে, নিজেদের স্বৈরাচারী-মৌলবাদী মানসিকতাটি উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ওরা বই দেখলে চমকায়, আতঙ্কিত হয়। ওরা ভুলে যায় ব্রেখ্‌টের কথা—'বই পোড়াতে হয় না, পড়তে হয়'। অমন মূল্যবান কথাটি বিস্মৃত হয় বলেই আধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় পুষ্ট বহু গ্রন্থ শোষক-স্বৈরাচারী শক্তির আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার-এর সময় আমেরিকায় বিভিন্ন তথ্যকেন্দ্রের লাইব্রেরি থেকে প্রগতিবাদী বই পোড়ানোর বীভৎস ঘটনা ঘটেছিল।

উপরিউক্ত ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে, মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে প্রতিবাদী বই-এর ভূমিকা অতুলনীয়। অতীতের সাথে বর্তমানের, মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের মেলবন্ধন সৃষ্টির ক্ষেত্রে বই-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়ে বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে

জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে ? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে, অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে' ! বই-এর এই অসামান্য ভূমিকার কথা মনে রেখেই পাঠকের বই পড়ার আনন্দ যাতে না কমে, সেদিকে সদা দৃষ্টি দিতে হবে। এমন বই লিখতে বা প্রকাশ করতে হবে, যার পড়ার শেষে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না, বরং কৌতূহল বা জীবন-জিজ্ঞাসা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। বই মানে এমন বই হতে হবে যা কবি সাদীর বিখ্যাত একটি কবিতার প্রথম অংশের ভাবনার অনুরণন জাগিয়ে বলবে—'My days among the dead are past/ Around me I behold' যেন 'লক্ষাধিক বছরের সমন্বিত জ্ঞান আমার অনন্ত জিজ্ঞাসার চেতনাশীল মন ও মননকে ঘিরে থাকে, বাঁচিয়ে রাখে, বাড়িয়ে তোলে'। অর্থাৎ বই যেন কেবল আলমারী-বন্দী থেকে সুদৃশ্য ড্রয়িংরুমের শোভাবর্ধক না হয়, যেন তা আমাদের সুচেতনাকে সদা জাগিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। কথাগুলো বলতে হচ্ছে একরাশ আশঙ্কা বুকে নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে চরম ভোগবাদ বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে গ্রাস করছে। তাই বাজারে আজ ভোগবাদী উপকরণের ছড়াছড়ি। বইকেও এ ধরনের নগ্ন উপকরণে পরিণত করার প্রয়াস আমাদের চোখে পড়ছে। প্রকাশকদের একটা অংশের মধ্যে অর্থলোভ প্রাধান্য পাওয়ার ফলে নিম্নরুচির বই প্রকাশের চটকদারি বিজ্ঞাপন অনেক পড়ুয়ার মনকে প্রলুব্ধ করছে। চেতনাবিনাশী এই প্রয়াস তিমিরবিলাসীদের মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে বলেই আজ বড় প্রয়োজন হয়ে উঠেছে প্রগতিবাদী সাহিত্যের। এমন সাহিত্য যে রচিত হচ্ছে না, তা নয় ; কিন্তু এ ধরনের বই-এর প্রকাশকদের সবার এমন অর্থপ্রাচুর্য নেই, যা দিয়ে তাঁরা উপযুক্ত প্রচার ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারছেন। এই কারণেই আজ বইমেলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন প্রকাশকদের সাথে পাঠককুলও একমত। এর আকর্ষণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বইমেলা তাই আজ কেবল কলকাতায় সীমাবদ্ধ নেই, কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলার ছোটো বড়ো নানা শহরে বইমেলা সগৌরবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই বইমেলা আজ বঙ্গসংস্কৃতির কেবল অলঙ্কার নয়, অহঙ্কারও বটে।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বইমেলার সূচনা। তখন এর পোষাকি নাম ছিল 'কলিকাতা পুস্তক মেলা', যার বর্তমান নাম 'কলকাতা পুস্তক মেলা'। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সল্‌তে পাকানোর কাজটি শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন কলেজ স্ট্রিটের জনা বারো প্রকাশক। তাঁদের চোখের সামনে তখন সদ্য দেখে-আসা ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলার উজ্জ্বল ছবিটা ঘোরাফেরা করছিল। তারই অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ঐ কয়েকজন প্রকাশক মিলে গঠন করেছিলেন 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক-সেলার্স গিল্ড'। কেবল গঠন নয়, ১৯৭৫-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারা ঐ নবজাত সংস্থার রেজিস্ট্রেশনও করিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর শুরু হয়েছিল গিল্ড-এর সদস্যদের উদ্যোগ, প্রকাশকদের কাছে আবেদন-নিবেদন, চাই চাঁদা অর্থাৎ অর্থ, আর বইমেলায় অংশগ্রহণ। বেশিরভাগ খরচটাই নিজেদের গাঁট থেকে দেওয়ার শপথ নিয়ে নেমে পড়েছিলেন বইমেলার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজে। এভাবেই অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসের বিপরীতে ময়দানের সামান্য অংশে জন্ম নিয়েছিল 'কলিকাতা পুস্তক মেলা'। ১৯৭৬-এ ঐ মেলায় অংশ নিয়েছিলেন মাত্র ৩৪জন প্রকাশক, স্টল হয়েছিল ৫৪টি। সেদিনের ঐ মেলায় মাত্র ২০-২৫ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। এই বইমেলার যখন অতি শৈশব দশা, তখন অর্থাৎ ১৯৭৭-এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার। শিক্ষার সাথে সাথে গুরুত্ব পেল সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক। গ্রন্থকে মানুষের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এল যুগান্তকারী পরিবর্তন। এই গ্রন্থাগারের সাথে জুড়ে দেওয়া হল বইমেলাকে। কলকাতা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও পৌরাঞ্চলে, এমনকি গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকেও আর্থিক অনুদান দিয়ে বলা হল নির্দিষ্ট করে দেওয়া বইমেলা থেকে বই কিনতে হবে। এরফলে বইমেলা কলকাতার সীমানা ছেড়ে পৌঁছে গেল জেলায় জেলায় শহরে শহরে। এদিকে 'কলকাতা পুস্তক মেলা'-র দশ বছর পূর্তির আগেই তার মুকুটে এসে গেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সোনালি পালক। অর্থাৎ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি পাওয়ার সাথে সাথে কলকাতা বইমেলা বিশ্বের ১৮টি বইমেলার একটি হওয়ার গৌরব অর্জন করল। বলা বাহুল্য, সে গৌরব আজও অটুট তো আছেই, একই সাথে নানা আঙ্গিকে ঘটেছে তার বিপুল বিস্তার।

কলকাতা বইমেলা তার গতিময় বর্ণবহুল যাত্রাপথে এনেছে নতুনত্বের স্বাদ। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই বইমেলায় প্রাধান্য পাচ্ছে 'থিম'। অর্থাৎ এক এক বছরে এক-একটি রাজ্য বা দেশকে বইমেলার 'থিম' হিসেবে বেছে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বছরের বইমেলায় ঐ রাজ্য বা দেশকে বিশেষ

গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই গুরুত্ব কেবল বই-এর মাধ্যমেই নয়, সঙ্গে থাকছে সেখানকার সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির নানাদিক, সেখানকার অভিনবত্বের নানা চালচিত্র। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার আদলে এই থিমের প্রচলনে মুগ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছেন বইপ্রেমী মানুষজন। ১৯৯১ থেকে পর পর কয়েক বছর 'থিম' হিসেবে কলকাতা বইমেলা চিহ্নিত হয়েছে অসম, ওড়িশা, ত্রিপুরা, বিহার, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের নামেও। তার পরের বছরগুলি থেকে প্রাধান্য পেয়ে আসছে বিভিন্ন দেশ। ১৯৭৭ -এ থিম ছিল ফ্রান্স। কিন্তু মেলায় অগ্নিকান্ডের কারণে ঐ বছর ফ্রান্স অংশ নিতে পারেনি। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৮-তে ব্রিটেন, ১৯৯৯-এ বাংলাদেশ, ২০০০-এ ব্রাজিল, ২০০১-এ ভারতবর্ষ, ২০০২-এ নেদারল্যান্ড, ২০০৩-এ কিউবা, ২০০৪-এ চিলি, ২০০৫-এ ফ্রান্স, আর ২০০৬-এ থিম-রাষ্ট্র হচ্ছে স্পেন। এইভাবে 'থিম' দেশগুলির সাহিত্য-শিল্পের প্রতি আমাদের বাংলার বইপ্রেমী মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, বেড়েছে কলকাতা বইমেলার জনপ্রিয়তা। এই জনপ্রিয়তা এবং বইপ্রেমীদের মুগ্ধতার কারণে ২০০৫-এর বইমেলায় সংযোজিত হয়েছে আরও কয়েকটি বিষয়। 'থিম' কান্ট্রির পাশাপাশি এসেছে 'গেস্ট অফ্ অনার' কান্ট্রি হিসেবে স্পেন। ঐ বছরেই চালু হয়েছে ইন্টারনেটে বই কেনার সুযোগ—'অন্‌লাইন বুক পারচেজ'। বইমেলা প্রাঙ্গণে চালু হয়েছে এ টি এম কাউন্টার, অর্থাৎ পকেটে হিসেব করা টাকা নিয়ে মেলায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পকেটে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড থাকলেই এ টি এম কাউন্টার থেকে বই কেনার সুযোগ। ২০০৫-এর বইমেলা থেকে চালু হয়েছে 'বুক গিফ্‌ট কুপন'। ছেলেমেয়ে বা নিকটজনদের বই উপহার দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা।

এইসব সুযোগ-সুবিধা এবং অভিনবত্বের কারণে বর্তমানে কলকাতা বইমেলার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বইমেলার বারো দিনে প্রায় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণ এই সত্যকে প্রমাণ করছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের বই ও পত্র-পত্রিকার স্টল সংখ্যা প্রায় ৯০০। স্থানাভাবে অনেক পুস্তক বিক্রেতাকে বইমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সূচনা বছরের বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার কেনাকাটা এখন পৌঁছেছে বিশ-পঁচিশ কোটি টাকার অঙ্কে। এ তো বাংলা বইয়ের জগতে রীতিমত বিপ্লব! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মাঝে কয়েক বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগেও একটি বইমেলা চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা বন্ধ করে দিয়ে সরকার কলকাতা পুস্তক মেলার পাশে থেকে সহায়তা দিয়ে চলেছে। এই মেলার ব্যাপক জনপ্রিয়তায় দাবি উঠেছিল, মেলার সময়সীমা বারো দিনের সাথে আরও কয়েকটা দিন যুক্ত করা হোক। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিধির কথা মনে রেখে ঐ দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব না হলেও মেলার উদ্বোধনপর্বটি জানুয়ারির শেষ বুধবারের পরিবর্তে তার আগের দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার করা হয়েছে। মেলা শুরুর পঁচিশ বছর পর থেকে এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে। কলকাতা বইমেলার এই আকাশচুম্বী সাফল্যের নিরিখে বলা যায়, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন অসম্ভব স্বপ্নপ্রত্যাশী প্রকাশক বইমেলার যে বীজটি পুঁতেছিলেন, সে বীজে কোনো বিষ ছিল না বলে আজ তা মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। আর এই মহীরুহ আজ কয়েক শ' শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। এইসব বইমেলা আজ আর কেবল বাণিজ্যিক ভাবনায় চালিত হচ্ছে না, বাণিজ্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক নানা ভাবনা। এই কারণে কলকাতা বইমেলা সারা দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে এক গৌরবময় স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছে। তাই তো ২০০৬-এর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় ভারত 'গেস্ট অফ্ অনার'-এর ভূমিকা পালনের মর্যাদা লাভ করেছে।

পরিশেষে বলি, বর্তমানে আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংকটের মধ্যদিয়েও পথ হাঁটতে বাধ্য হচ্ছি। ধ্বংসাত্মক বিশ্বায়নের আঘাতে মনের সুকোমল বৃত্তিগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ভোগবাদের নগ্ন চেহারা প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। এরফলে মানুষের সংস্কৃতি চেতনা ও সুগভীর জীবনবোধ বেশ কিছুটা আহত হচ্ছে। এই অবস্থায় সমাজকে সঠিকভাবে জানা এবং চেনার জন্য প্রগতিবাদী সাহিত্যপাঠ ও অনুশীলন খুবই জরুরি। বলা বাহুল্য, এই অধ্যয়ন এবং অনুশীলনই তাৎক্ষণিক চটুলতায় ক্ষয়প্রাপ্ত জীবনবোধকে রক্ষা করতে পারে। এর জন্যই বই-এর ভূমিকা অপরিহার্য। প্রযুক্তির যতই উন্নতি হোক না কেন, স্বীকার করতেই হবে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে এবং জীবনবোধের উন্নয়নে বই-এর কোনো বিকল্প নেই। এই বাস্তবতার দিকটি মনে রেখেই প্রগতিবাদী বই প্রকাশের গুরুত্ব যেমন বেশি, তেমনি তা প্রচারের আলোকে নিয়ে আসার মাধ্যমে পাঠকের চেতনাকে স্পর্শ করার জন্য বইমেলার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তাই এক কথায় বলা যায়, বই এবং বইমেলা হল মানুষের, মানবসভ্যতার অগ্রগতির সোপান।

ঃ ঋণ স্বীকার ঃ

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ● গণশক্তি ●
প্রবীর রায়চৌধুরী ● সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ●
সাহিত্য পরিচয় (এ বি পি এ)

বিতর্ক বনাম সচেতনতা

ডঃ সুশোভন দাস

প্রধান শিক্ষক, দুর্গাপুর পল্লীমঙ্গল বিদ্যামন্দির, *হাওড়া*

অপ্রচলিত কোনো কিছুকে প্রচলন করতে গেলে চিরকাল কিছু বাধা এসেছে। বাধার প্রাচীরকে ভেঙে এগোতে হয় বলেই আপোষ শব্দটার এত ব্যবহার। আমরা যারা বিদ্যালয় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তাদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন করবার প্রচেষ্টা সবসময়ই অনেকের কপালে কুঞ্চনরেখার সৃষ্টি করেছে। যে কোনো রকম পরিবর্তন অনেকের অনেক বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে ঠিক করতে হয়েছে। এই প্রক্রিয়া আগেও ছিল, বর্তমানের বুদ্ধিজীবী সমাজে আজও আছে এবং পরবর্তীকালে ঘুচে যাবে এটা ভাবনার মধ্যে না আনাই ভালো। অতএব আমরা কী করব?

আমি ছাত্রাবস্থায় হাতে বই নিয়ে, যেমন জুটতো তেমন জামা-প্যান্ট পরে, হাওয়াই চপ্পল কিংবা চামড়ার চটি পায়ে দিয়ে স্কুলে যেতাম। সেখানে টিফিন কিংবা জলের বোতল ছিল না, ছিল না ব্যাজ কিংবা বই-খাতা নেবার বিশেষ ব্যাগ। শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখার অস্তিত্বই ছিল না। আর আজকের সেই স্কুলের ছাত্রেরা সাদা জামা-নীল প্যান্ট পরে, বুকে স্কুলের পরিচয়জ্ঞাপক ব্যাজ পরে যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন মনে হয় আমরা সেইসময় কী যেন পাইনি। এখনকার সেই স্কুলের প্রতিটা শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা আছে, সুন্দর ঝক্‌ঝকে বাড়িতে পড়াশুনা করবার যাবতীয় উপাদান আছে, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে পড়াশুনা করবার তাগিদটা একটু কম অনুভূত হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে আদায় করে নেবার চেষ্টা অনেক কমে গেছে বলে মনে হয়। এটা হয়ত প্রতিযোগিতার যুগে গৃহশিক্ষক নামক প্রথার প্রচলনের জন্য নির্ভরশীলতার বদল। তবু বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গের আন্তরিক প্রয়াস, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রদের-অভিভাবকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পুরানো সেই বিদ্যালয়ের অনেক পরিবর্তন এবং উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে।

বিদ্যালয়ের এই পরিবর্তনকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার যুগে করা প্রয়োজন বলে অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ সবাই মেনে নিতে চায়নি। কেউ কেউ ছাত্রদের নির্দিষ্ট পোষাক চালু করবার সময় প্রতিবাদ করেছেন, কেউ কেউ গরীব হবার অজুহাতে ছাত্রকে নির্দিষ্ট পোষাকে স্কুলে পাঠাতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন, কেউ কেউ একটু এগিয়ে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও স্কুলে নির্দিষ্ট পোষাক পরে আসার জন্য দাবি করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, ডানকুনির মাদার ডেয়ারির কর্মচারীরা প্রত্যেকে কাজের সময় নির্দিষ্ট পোষাক পরে কাজ করেন, পুলিশ বিভাগে, সামরিক বিভাগে এবং আরো অনেক সরকারী ও বেশিরভাগ বেসরকারী কারখানা বা অফিসে কর্মচারীরা কাজের সময় নির্দিষ্ট পোষাক পরেন তাহলে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদেরও শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট পোষাক পরে পাঠদান করলে ভালো হয়। 'যেমন খুশি সেজে' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ের অঙ্গনে আসায় কিছু অভিভাবক আপত্তি করেন।

আমাদের যুক্তি ছিল পাশের বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ড্রেসে যখন যায় তখন আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ওদের ওপরের চাক্‌চিক্য দেখে ভাবে ওদের পঠন-পাঠন খুব ভালোভাবে হয়, ওদের সকলের মান খুব উন্নত। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্টভাবে এগিয়ে থেকেও হীনম্মন্যতায় ভোগে। এই হীনম্মন্যতাবোধ কাটাতে, কে স্কুলের ছাত্র আর কে ছাত্র নয় এটা স্পষ্ট করতে, ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে, কোন্ ছাত্র গরীব আর কোন্ ছাত্র অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সেই তফাৎ দূর করতে এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্কুলের নির্দিষ্ট পোষাক পরে আসতে বলা হচ্ছে। অভিভাবকদেরকে বলা হয়েছিল যে আমরা আপনাদের সম্পদকে কীভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করে সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় সেই চিন্তাভাবনা করেই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট পোষাক-এর প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছি। আমাদের সঙ্গে অভিভাবকদের কোনোরকম ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্পর্ক কারোরই নেই যে আমরা অভিভাবকদের বাড়তি খরচ করিয়ে আনন্দিত হব। অভিভাবকদের আরো বলা হলো যে তাঁরা সকলে যদি আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল বলেন তাহলে ছাত্রদের নির্দিষ্ট পোষাক পরে বিদ্যালয়ে আসার জন্য নিয়ম চালু করা হবে না। ছাত্রদের কিংবা অভিভাবককে আমরা জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত বা নিয়ম মেনে চলতে যদি নাও বলি তবু আমরা মাইনে পাব এবং নিয়মানুসারে বেতন বৃদ্ধি ঘটে যাবে।

আমাদের বিদ্যালয়ে এবং আমাদের মত অনেক বিদ্যালয়েই অনেকটা এরকমভাবেই যুক্তি-তর্কের মধ্যে দিয়ে প্রায় সব অভিভাবক পরিবর্তিত সময়ের উপযোগী বিভিন্ন পরিকল্পনা সমর্থন করেন এবং চালু করতে সাহায্য করেন। কিন্তু কিছু প্রশ্নের উত্তর কী হওয়া উচিত সেই নিয়েই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে।

বাস্তবসম্মত ভাবে এবং নীতিগত ভাবে দেখলে বিদ্যালয়ে কর্মরত সকলকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের উপযুক্ত পোষাকে বিদ্যালয়ে আসা ভালো। এরজন্য বলা যেতে পারে অনেক কথা, করা যেতে পারে অনেক তর্ক, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনতে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণের, ভাব-ভঙ্গির বিশৃঙ্খলা কখনো সাহায্য করবে না। এটা ভীষণভাবে সত্যি যে বিদ্যালয়ের একেবারে ছোটো থেকে বড়ো সব ছেলে-মেয়ে তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে। ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সুন্দর করে কোন্ স্যার কেমনভাবে চলেন, কেমন করে কথা বলেন, পড়ান, কিংবা চুলের স্টাইল ঠিক করেন — সেইসব কিছু অবিকলভাবে বাড়িতে করে দেখায় এবং সকলে দন্ত বিকশিত করে উপভোগ করে। ছোটোবেলা থেকে বড়োদেরকে অসম্মান বা অকারণ অশ্রদ্ধা করা উচিত নয় এই বারণটুকু করতে বড়োরা ভীষণ ভুলে যান। অতএব কোনো শিক্ষক যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন মনোভাব দেখিয়ে কিংবা প্রশাসনিক জটিল শিথিলতার সুযোগকে অপব্যবহার করে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বারমুন্ডা প্যান্ট, জম্‌কালো হাতকাটা গেঞ্জি, পায়ে পাওয়ার সু এবং চোখে সানগ্লাস আর হাতে মাস্তান চেন বা বালা পরে পাঠদান করতে আবির্ভূত হন, তাহলে সেখানে ছাত্রদের মনোযোগ পাঠের প্রতি থাকার পরিবর্তে পাঠদানকারীর বিচিত্র পোযাক, শিক্ষকের অতি আকর্ষণীয় রুচির প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। ছাত্রের কাছে শিক্ষক যদি হাস্যস্পদ, মজার কিংবা অশ্রদ্ধার হন, সেক্ষেত্রে পারস্পরিক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থার মূল কাঠামো নড়বড়ে যান্ত্রিকতায় চলার জন্য আস্থাহীনতার জন্ম দেয়। আর কোনোভাবে সাধারণের মধ্যে কোনো বিদ্যালয় সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরী হলে সেই বিদ্যালয়ে অভিভাবকেরা ছেলে-মেয়েকে ভর্তি করাতে চান না। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক পয়সা খরচ করেও একজন অভিভাবক সেখানকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের খুব সামান্যই জানতে পারেন। আর কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব সচেতনভাবে এবং কূটনৈতিকভাবে সবসময় নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে, অভিভাবকদের বক্তব্য শোনে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের কোনো প্রশ্নের জবাব তাঁরা দেন না। অথচ আমাদের অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিলমাত্র বিচ্যুতি দেখলেই চায়ের দোকান, বাজার থেকে বাড়িতে বাড়িতে, পাড়ায় পাড়ায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। একই সাথে প্রচার মাধ্যমগুলো খবর তৈরী করতে উঠে পড়ে লেগে যায়।

এইরকম পরিস্থিতিতে সমাজের পরিবর্তিত মানসিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে দায়িত্ববোধ, সামাজিক মূল্যবোধ এবং কর্তব্য পালনের সচেতনতা নিয়ে অগ্রসর হলে আমাদের আগামী দিনগুলোয় চলার পথ সুদৃঢ় হবে। অযথা জেদের বশে পোশাকে বিপ্লব আনার সস্তা পথে না চলে যে গুরুদায়িত্বের ভার আমরা বেকারীত্ব কাটিয়ে পেয়েছি, তার জন্য কিছুটা পরিশ্রম এবং সামান্য স্বার্থত্যাগ করলে বিপ্লব না হোক আমাদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, আশা-ভরসা ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে। যেসব বিদ্যালয় ছাত্রাভাবে মুমূর্ষু, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং আগামীদিনে যারা ছাত্রাভাবে মুমূর্ষু হতে চলেছে তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত সচেতনতার সাথে দ্রুত হাল ধরা প্রয়োজন

এটা সবার জানা আছে যে একটা সময়ে শিক্ষকমশাইরা ধুতি পাঞ্জাবি পরে অতি সংযত জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষকতা করতেন। আমার বাবা একজন শিক্ষক ছিলেন। আমাদের বাড়িতে রেডিওতে হিন্দি আধুনিক গানতো নয়ই, এমনকি বাংলা গান শোনা ছিল অকল্পনীয় এবং সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। বাবা মানসিকতার দিক থেকে প্রগতিশীল ছিলেন। কিন্তু তবু কিছু ক্ষেত্রে চরম রক্ষণশীলতার মধ্যে দিয়ে ছোটোদের মানসিকতা, রুচিবোধ এবং আচার-আচরণের উপযুক্ত বিকাশের জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বাবা-মা'র বিশৃঙ্খল আচরণ, কুরুচিকর এবং অসামাজিক কার্যকলাপ শিশুমনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে বাধ্য। আমার বাবা চব্বিশ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত বেড়মজুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে রেলের স্কুলে চাকরি করতে আসার পর ধুতি পাঞ্জাবি পরা ছেড়ে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে ফুলপ্যান্ট আর সার্ট পরতে শুরু করলেন। এটার জন্য কেউ বাধা দেয়নি বা তখন এটার সমালোচনা কেউ করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। আর বর্তমানে আমি এবং আমার মত নতুন প্রজন্মের প্রায় সব শিক্ষকমশাই জামা-

প্যান্টেই স্বাভাবিক, সেখানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাবার কথা কেউ ভাবতেই পারি না। এই পরিবর্তন সামাজিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সময়ের পরিবর্তনের সাথে হয়েছে। এক্ষেত্রে নিঃশব্দে যদিও সব পরিবর্তন ঘটেনি, তবু ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা সবার কাছে এসেছে। ঠিক একইরকম পরিবর্তন যা নিয়ে এখন কেউ প্রশ্ন তোলেন ; না সেটি হলো বিবাহিতা হিন্দু শিক্ষিকাদের ঘোমটা না দেওয়া। অনেক বাড়িতে আজ এই রীতি বিদায় নিয়েছে। বর্তমানে কোনো কোনো চাকুরিরতা মহিলা বিবাহিতা হয়েও আধুনিকতায় শাঁখা সিঁদুর বর্জন করে চলেন। শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা শহরাঞ্চলে প্রতিক্রিয়া না ঘটালেও গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে আলোড়ন তুলেছে এবং তুলবে।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কার এবং কুসংস্কারের সীমানা নির্দিষ্ট না থাকায় একই কাজকে কেউ বলবেন এটা হলো সংস্কার, আবার কেউ ব্যাখ্যা করবেন কুসংস্কার বলে। কিন্তু আমাদের অবস্থানের কথা মাথায় রেখে সঠিক পথে চলার জন্য অতি অবশ্যই বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে দরকার খোলা মনের আলোচনা, চলুক গঠনমূলক সমালোচনা, হোক্ যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক। তবে যা কিছু করা হোক্ সেটা কখনোই ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে নয়, সুচেতনাকে বাদ দিয়ে নয় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামাজিক সম্মানকে নষ্ট করে নয়।

স্বামীজীর স্বদেশভাবনা

ডঃ প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়
শিক্ষক, শহীদ রামেশ্বর বিদ্যামন্দির, উত্তর ২৪ পরগণা

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিপুল বিস্ময়। বিশ্বব্যাপী একটি পরিচিত নাম তিনি। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আধার হিসাবেই তাঁর সমধিক খ্যাতি। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য এই সন্ন্যাসীর যে বিশেষ ভূমিকা তা উদ্‌ঘাটিত হওয়া জরুরী। স্বামীজীর অবর্তমানে ভগিনী নিবেদিতা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়ায় বেলুড় মঠ ছাড়তে বাধ্য হন। নিবেদিতার দেশাত্মবোধ ও কর্মকান্ড স্বামীজীর নির্দেশেই যে অক্ষরে-অক্ষরে পালিত, তা প্রমাণসাপেক্ষ।

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ — বিশ্বের এই দুটি বিপদ এতদিন একে অন্যের গলা জড়িয়ে পথ হাঁটছিল, কিন্তু বিশ্বায়নের দামামা বেজে ওঠায় সাম্রাজ্যবাদ ও ভোগবাদের বিশ্বায়নে পৃথিবীতে এখন দেখা দিয়েছে নাভিশ্বাস। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্র আজ আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে বুড়ো আঙুল দেখায় এবং বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যে কোনদিন যে কোন মুহূর্তে যে কোন "challenge" জানাতে প্রস্তুত। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা স্বভাবতই বিব্রত এবং এই বিপদের দিনে আমরা খুঁজে পাই বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যার দ্বারা স্পষ্ট হয় ধর্মের অর্থ শুধু ঈশ্বরের নাম নেওয়া নয়, ধর্ম হল কর্মকেন্দ্রিক এবং সুস্থ ও শ্রীমন্ডিত জীবন যেখানে শোষণের প্রবেশাধিকার একেবারেই নেই।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। আমেরিকার শিকাগো মহাসভায় পাশ্চাত্যের উগ্র ভোগবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বামীজী সে সময় প্রতিবাদে মুখর। তিনি বললেন, "মানুষ ঈশ্বরের প্রতিহিংসায় বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের প্রতিশোধকে সে কখনই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ইংরেজের ওপর ইতিহাসের সেই প্রতিশোধ নামবে। তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে ফেলেছে, লুটে নিয়ে গেছে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আর আমাদের দেশের মানুষ সারাটা দেশজুড়ে পেটে হাত দিয়ে পড়ে আছে।"

"Swami Vivekananda in America :New Discoveries "–Marie Louise Burke, Adyitya Ashrama, Calcutta, 1966, P-25.

অগ্নিময় ভাষায় ইংরেজের উদ্দেশে তিনি সেদিন বললেন, "এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে বিজেতার তরবারি নিয়ে তোমরা আমাদের দেশে গিয়েছ ..... আমাদের পায়ের তলায় দলেছ, ধুলোর মতো তুচ্ছ জ্ঞান করেছ, তোমরা মাংসাশী জানোয়ার, মদ খাইয়ে তোমরা আমাদের অধঃপতিত করেছ, অসম্মানিত করেছ আমাদের নারীকে, বিদ্রুপ করেছ আমাদের ধর্মকে।"

The Daily Chronic (England), quoted in Indian Mirror, 28 November, 1893.

স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন — ব্রিটিশ সরকার ভারতকে কী দিয়েছে? কঠোর বিদ্রুপের সঙ্গে স্বামীজী আমেরিকার সভ্য সমাজকে শুনিয়েছেন "তিনটি 'ব' — বাইবেল, ব্র্যান্ডি আর বেয়নেট।"

"Swami Vivekananda in America", Page 596.

"স্বামীজী চাইতেন ভারতবর্ষের মানুষ চূর্ণ করে দিক ব্রিটিশের দাসত্ব শৃঙ্খল, তোপের মুখে উড়িয়ে দিক তাদের স্বৈরাচারের দুর্গ। তাতে যে আগুন জ্বলবে তা দাবানলের মতো সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে। আর ব্রিটিশ শাসনকে ধ্বংসের মুখে দেবে দাঁড় করিয়ে, আর সেই যুদ্ধে প্রথম শোনিত দেবেন তিনি।"

"স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" — স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রথম পর্ব, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ৮

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্য। এই কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবিগুরুর স্বামীজী স্মরণ প্রসঙ্গত স্মর্তব্য —

"ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ জনে!
....
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।"

শুধু আমেরিকাতেই নয়, খোদ ইংল্যান্ডেও তিনি ব্রিটিশ শাসনের জুজু সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য করলেন। লন্ডনে তিনি বললেন, "ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছি মিছি হৈ হৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়। চেপে বসুক, নিজেদের 'ইনডিপেনডেন্ট' বলে 'ডিক্লেয়ার' করুক, হেঁকে বলুক — 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম'। আর সমস্ত স্বাধীন গভর্নমেন্টকে নিজেদের ডিক্লেয়ারেশন' পত্র পাঠিয়ে দিক; তখন একটা হৈ চৈ উঠবে। .... কেবল কি গলাবাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে .... তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক। ....পড়ুক গুলি আমার বুকে। আমেরিকা, ইউরোপ — একবার কি রকম কেঁপে উঠবে।"

"লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ"—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ — ১৩৬০, পৃঃ ১৯০-১৯১

ইংরেজদের সম্পর্কে গুডউইনকে লন্ডনে একদিন স্বামীজী বললেন ঃ "ভারতবর্ষটিকে 'হিপনোটাইজ' করে ফেলেছে। তাইতেই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবাসীর বুকের উপর বসে রক্ত চুষে খাচ্ছে। কিন্তু যেদিন 'হিপনোটিজম' চুলোয় যাবে এবং ভারতবাসীরা নিজেদের ভিতরকার শক্তি বুঝতে পারবে, সেদিন তোমাদের লেবু নিংড়ানোর মতো চেপটে মেরে ফেলবে — will squeeze you like lemon,"

"লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" — মহেন্দ্রনাথ দত্ত

সিস্টার ক্রিস্টিন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বামীজী একদিন বলেছিলেন ঃ "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট করার পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল। সে জন্য আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। এইজন্য আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাকসিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের ভিতর থেকে আমি কোন সাড়া পাইনি। দেশটা মৃত।"

"Swami Vivekananda : Patriot Prophet"– Bhupendranath Datta, Naba Bharat Publishers, Calcutta, 1954.

স্বামীজীর ইচ্ছায় মিস্ ম্যাকলাউড বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। লিজেল রেমঁ স্বামী বিবেকানন্দ গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে লিখেছেন ঃ "মিস্ ম্যাকলাউড় স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, এগুলি একেবারে আগুনে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা। স্বামীজীর অনেক কিছুই করেছিলেন। চন্দননগরের মধ্যদিয়ে ভারতে অস্ত্র চালান হয়েছে। আমি (মিস্ ম্যাকলাউড) সেগুলি কিনেছি। অস্ত্রসহ একটি নৌকা ধরা পড়ে, কিন্তু তার সূত্রে কাউকে ধরা যায়নি।"

"নিবেদিতা লোকমাতা" — শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় খন্ড, ১৩৯৪, পৃঃ ৩১

"মহাপুরুষজীর কথা" নামে একটি রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "রামনাদের মহারাজা শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যাবার জন্য দশ হাজার টাকা দেবেন বলে স্বামীজীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তার প্রতিশ্রুতি রাখেননি। কারণ, তাঁর ভয় হয়েছিল, স্বামীজী আমেরিকায় রাজনৈতিক কার্যাদি করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রায় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

'উদ্বোধন', ৩৬ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৪৫

"ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ যে ভারত পরিক্রমাকালে স্বামীজীর গতিবিধির ওপর নজর রাখত, তার কিছু নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে। বেলুড় মঠের প্রবীণতম দু'জন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী নির্বাণানন্দ এবং স্বামী অভয়ানন্দের সূত্রে জেনেছি — তিলকের সঙ্গে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে যখন বেলুড় মঠে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন স্বামীজী তিলককে বলেছিলেন "বাহুবল ছাড়া ব্রিটিশকে ভারত থেকে উৎখাত করা যাবে না এবং তা-ই করতে হবে।"

"বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" — শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ৫ম খন্ড, ১৯৮১, পৃঃ ৪৩৮।

মহাপ্রয়াণের আগে বেলুড় মঠে কামাখ্যা মিত্রকে স্বামীজী বলেছিলেন, "What India needs today is bomb"– 'Patriot Prophet', Page 212

বেলুড় মঠের প্রবীণ ও বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী হিরন্ময়ানন্দ বলেছেন, "স্বামীজী প্রথমবার বিদেশ থেকে আসার পর একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দকে বললেন ঃ দ্যাখ, আমি বিদেশে

বোমা বানানো শিখে এসেছি। আমি যদি বোমা বানিয়ে দিই, তোরা তা লাটসাহেবের বাড়ীতে ফেলে আসতে পারবি ?"

"স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম", প্রথম পর্ব—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১

দেশীয় রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় স্বামীজীর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিকল্পনা কতখানি গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু তাঁর এই প্রয়াসের পক্ষে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।

"It is however, found in official records in the early nineties and before he went abroad. Vivekananda's intimacy with some of the 'petty princes' of western India attracted the attention of the Supreme police boss, the Director General of Criminal Intelligence of India."

Amrita Bazar Patrika, Independence day supplement, 15th August, 1971, page 5

ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের শান্তি, সম্প্রীতি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতাই ছিল স্বামীজীর সারা জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান। তাই তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বলেছেন, "ভুলিও না —নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ, 'বর্তমান ভারত' উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৪

ভারতের সামগ্রিক উন্নতির জন্য তিনি বলেছেন "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে।"

স্বামী বিবেকানন্দ — 'ভারতের পুনর্গঠন', সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৫, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭

'ভারতের তরুণ দল ও ছাত্রগণ যাতে তামসিকতা পরিহার করে একনিষ্ঠ কর্মকেই ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে — সে জন্য এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বেদান্ত হাতে নিয়ে বলেছেন, "Arise, awake and stop not till the goal is reached."

সমাজে বরিষ্ঠ নাগরিকদের ভূমিকা

রমাপ্রসাদ দত্ত

প্রাক্তন শিক্ষক, ভদ্রকালী উচ্চবিদ্যালয়, হুগলী

বর্তমানে আমরা একবিংশ শতকের সূচনাপর্বে অবস্থান করছি। মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে একটা শতককে অতিক্রম করে নতুন শতকে প্রবেশ করেছি। নতুন শতক একবিংশ শতক। অবশ্যই তা খ্রিষ্টীয় অব্দ অনুসারে। বিগত শতক অর্থাৎ বিংশ শতকে বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দ্রুত সমাজ বিবর্তনের ছবি ফুটে ওঠে। যে পরিবর্তনের গতিবেগ ইতিহাসের পাতায় পূর্বের কয়েকটি শতকে লক্ষ্য করা যায়নি। বিবর্তনের এই গতিশীলতার কারণ সম্ভবত বিজ্ঞাননির্ভর যন্ত্রসভ্যতার দ্রুত বিকাশ। ক্রমোন্নত যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান শতকের শেষপর্বে সামাজিক পরিমন্ডলের ছবি কেমন হবে তা বোধহয় কারোপক্ষে বলা সম্ভব নয়। লক্ষ্য করার বিষয়, বিগত ১৫-২০ বৎসর ধরে দেশে দেশে বিশ্বায়নের এক গতিময় তরঙ্গ বয়ে বেড়াচ্ছে। দূরদর্শন, দূরভাষ, কম্পিউটর, সেলফোন ইত্যাদি প্রযুক্তিধারার অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রের সৌজন্যে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের ঘটনা বা পণ্যদ্রব্য প্রায় মুহূর্তের মধ্যে মানুষের চোখের আয়নায় বা হাতের মুঠোয় চলে আসছে। পরিণতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রযুক্তিক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে বা আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে যেমন উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন মানুষের ভোগবাদের সীমাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত জীবনযাত্রার উপকরণ লাভের কারণে মানুষ অনেক কাজই এখন হাতে-কলমে বা কায়িক শ্রমের বিনিময়ে সম্পন্ন করছে না। যন্ত্র ব্যবহার করে অল্প আয়াসে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক কাজ সম্পন্ন করে নিচ্ছে। এর ইতিবাচক দিকটিই মানুষ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর নেতিবাচক দিকের কথাও তো চিন্তা করা দরকার। যেকোনো বিষয়ে নিজহাতে সম্পন্ন সৃজনশীল কাজে সাফল্যলাভের আনন্দ বা তৃপ্তি অন্য কোনোভাবে পাওয়া যায় না। 'সৃষ্টি সুখের উল্লাস'-এর অনুভূতি সম্পূর্ণ পৃথক। এছাড়া আছে অধিকসংখ্যক মানুষকে কাজে অঙ্গীভূত করা। উৎপাদন ব্যয় বহুজনের মধ্যে বন্টিত হয়ে যাওয়া। অনেক মানুষের আয়ের উৎস খুঁজে পাওয়া। এই সমস্ত দিকগুলি বর্তমানে উপেক্ষিত। যন্ত্রসভ্যতার যুগে এই আয় বন্টনের নীতি সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে আর্থ- সামাজিক পরিমন্ডলে সমস্যার সৃষ্টি করছে। ধনী সম্প্রদায় এবং গরিব শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। দেশে বেকার মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চয়ই কোনো সমাজের সুস্থতার লক্ষণ নয়। সমাজের সুস্থতা বজায় রাখাইতো প্রতিটি নাগরিকের আন্তরিক কামনা। সেক্ষেত্রে সমাজে বরিষ্ঠ নাগরিকদের দায়িত্ব বা ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমানে ৬০বৎসর উর্দ্ধ প্রতিটি মানুষ বরিষ্ঠ নাগরিক রূপে চিহ্নিত। উন্নত জীবনযাত্রা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমানে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর ৬০-৬৫ বৎসর বয়সে মানুষের জীবনকাল শেষ হয়ে যায় না। অধিকাংশ মানুষ এখন ৮০-৮৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকেন। হয়তো এই বয়সে মধ্যগগনের মতো ক্ষিপ্রতা বা দীপ্তি থাকে না। কিন্তু অভিজ্ঞতার ঝুলি ততদিনে অনেক বড় আকার ধারণ করে। সমাজকে সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি উজার করে দিলে ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হয় না। অন্যপক্ষে সমাজের প্রভূত লাভ হয় ।

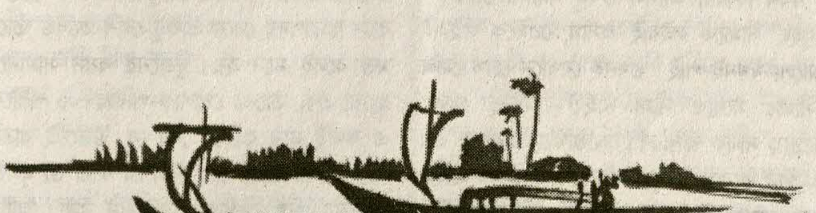
এ যুগে কর্মযোগী মানুষ সমাজের প্রবীণ মানুষদের পরামর্শকে পাথেয় করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে পারে। সমাজ বিবর্তনের ধারাকে গতিশীল রাখতে এবং সামাজিক ঐতিহ্যের বন্ধনকে ধরে রাখতে প্রবীণ নাগরিকরাই সঠিক দিশা দেখাতে পারে। সে কারণে ইংরাজিতে বলা হয় 'Senior citizens are today's

torch bearers'। বাস্তব জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে সমাজের সর্বস্তরের বরিষ্ঠ নাগরিকদেরই দায়িত্ব নিতে হবে পুরাতন ঐতিহ্য এবং আধুনিক ভাবধারার মধ্যে মেলবন্ধন রচনার পথ প্রশস্ত করা। নবীন-প্রবীণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই একটাই লক্ষ্য সমাজকে উন্নত করা। সমাজের সুস্থতা বজায় রাখা।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিয়ত হাল্কা বা ভারী কর্মকান্ড চলছে। সেই সমস্ত কাজে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাকে বেশি বেশি করে প্রয়োগ করা হ'চ্ছে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে নবীন প্রজন্ম বিশ্বের অনেক তথ্য অতি সহজে জানতে পারছে। অতি সহজে আয়ত্ত করতে পারছে। কিন্তু শুধু কিছুসংখ্যক মানুষের মগজ ভারী হয়ে থাকলে তো দেশের আপামর মানুষের কল্যাণসাধন ঘটবে না। তার জন্য চাই সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সার্থক রূপায়ণ। এই পরিকল্পনা রচনা এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অভিজ্ঞ, বাস্তববাদী বিশেষ মানুষের পরামর্শ এবং সক্রিয় সহযোগিতা। বহু প্রবীণ মানুষ আছেন যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। সমাজের তথা দেশের কর্ণধারগণ প্রয়োজনবোধে সেইসব বরিষ্ঠ মানুষদের মূল্যবান পরামর্শ বা সহযোগিতা গ্রহণ করলে গঠনমূলক কাজে অনেক ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ থাকে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—'Wise People learn from other People's mistakes'। সেই প্রেক্ষিতে বলা যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা রচনা এবং রূপায়ণে প্রয়োজনমাফিক পরামর্শ দিয়ে বা সক্রিয় সহযোগিতা করে প্রবীণ নাগরিকবৃন্দ সমাজকে তথা দেশকে সমৃদ্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রসারের ক্ষেত্রে এবং সকল স্তরের মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধ, সহমর্মিতাবোধের বিস্তার ঘটানোর বিষয়ে পরিশীলিত চিন্তার ধারক ও বাহক বরিষ্ঠ মানব সম্প্রদায়ের উপর অধিক দায়িত্ব বর্তায়। একথা বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্য বলা দরকার। তৃণমূলস্তর থেকে শুরু করে উচ্চ প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা সহযোগিতা লাভের আশায় অনেক সময় স্থানীয় বরিষ্ঠ মানুষদের আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবীণ মানুষ এগিয়ে আসেন বা সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তেমনটা নয়। শারীরিক দিক থেকে অসুবিধা না থাকলে সমাজের সর্বস্তরে নারী- পুরুষ নির্বিশেষে প্রবীণ নাগরিকদের এবিষয়ে সচেতন থাকা অবশ্যই কাম্য। এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকলে যেমন দেশ ও দশের কাজে নিয়োজিত থেকে নাগরিক দায়িত্ব পালন করা যায়। তেমন অবসর জীবনকে সুষ্ঠুভাবে অতিবাহিত করার সুযোগ ঘটে।

অতীতকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবল বর্তমানকে নিয়ে আচ্ছন্ন থাকলে সমাজে গতি আসবে না। আবার নস্ট্যালজিক চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকলেও গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। অতীত আর বর্তমান পরিমন্ডলের সুষম মেলবন্ধনের মাধ্যমে সমাজে যথার্থ গতি সঞ্চারের সম্ভাবনা। অতএব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে বরিষ্ঠ এবং নবীন নাগরিকবৃন্দকে অত্যন্ত সচেতন ভাবে সামাজিক পরিমন্ডলকে উন্নত করার সার্থক ভূমিকা নিতে হবে।



সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্র ছোটগল্পের দুই কিশোর

জয়সীমা বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সোনার তরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল 'আপদ' (১৩০১) এবং 'অতিথি' (১৩০২)। দুটি গল্পেরই প্রধান চরিত্র দুটি কিশোর— নীলকান্ত এবং তারাপদ। গল্পদুটি পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। "অতিথি যেন আপদের বিপরীত ছবি।" সমালোচক তপোব্রত ঘোষ বলেছেন, "গল্পগুচ্ছের 'আপদ' আর 'অতিথি' একসঙ্গে যেন 'দুই পাখি' কবিতারই গল্পভাষ্য। 'আপদ গল্পের নীলকান্ত খাঁচার পাখি, 'অতিথি' গল্পের তারাপদ বনের পাখি।" তারাপদ তাই বনের পাখির মতোই বলে —"আকাশ ঘন নীল,/ কোথাও বাধা নাহি তার।" আর 'খাঁচার পাখি'র থেকেও নীলকান্ত বেশি খাঁচাপ্রিয়। কেন-না 'খাঁচার পাখি'র দীর্ঘশ্বাস ছিল (খাঁচার পাখি বলে, 'হায়/ মোর শকতি নাহি উড়িবার')। নীলকান্তের দীর্ঘশ্বাস শুধু নয়, চোখের জল পড়েছিল 'খাঁচাহীন' হবার দুঃখে। অর্থাৎ সংসার থেকে নীলকান্ত কোনভাবেই মুক্তি চায়নি। কিংবা নীলকান্তের কাছে মুক্তির সংজ্ঞা ছিল অন্যরকম যা কবির শেষ জীবনের লেখা 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৩০ সংখ্যক কবিতায় ফুটে উঠেছে —'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। /অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময় / লভিব মুক্তির স্বাদ।' 'জীবনস্মৃতি'তেও রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন—"এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন, মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধ ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী দেখিল— ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানে দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।" 'আপদ' গল্পের নীলকান্ত এই সত্যের সার্থক রূপায়ণ। 'অতিথি'র তারাপদ এর বিপরীত দিকে অবস্থান করেছে। যেখানে নীলকান্ত বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছে, সেখানে তারাপদ সুদূরের পিয়াসী। তার মূল মন্ত্রই হল—

"জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।"

অথচ উভয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্যও লক্ষ্যণীয়। এইভাবে সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্যের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে গল্পদুটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

'আপদ নীলকান্ত' এবং 'অতিথি তারাপদ'র আবির্ভাব হয়েছে গল্পে অকস্মাৎ এবং দুজনেই যাত্রাদলের। একজন যাত্রা করতে যাবার পথে নৌকাডুবিতে দলছাড়া হয়েছে (নীলকান্ত), অন্যজন (তারাপদ) জিমন্যাস্টিকের দল থেকে নন্দীগ্রামে যাত্রাদলে যোগ দিতে বেরিয়েছে। আবার দু'জনেই আশ্রয় পেয়েছে ধনীপরিবারে। সবথেকে বড় ব্যাপার হল অপরিসীম মমতাময়ী মাতৃস্থানীয়া দু'জন মহিলার সান্নিধ্য লাভ করেছে এরা দু'জনেই। নীলকান্ত লাভ করেছে কিরণময়ীর করুণা, আর তারাপদর সামনে মূর্তিমতী মা হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন অন্নপূর্ণা।

নীলকান্ত সম্পর্কে কিরণময়ীর মনোভাব —"......আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।" তারাপদ সম্পর্কে অন্নপূর্ণার মনোভাব— "অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন— মনে মনে কহিলেন,"আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে, ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।" এক্ষেত্রে নীলকান্ত এবং তারাপদ উভয়েই ভাগ্যবান।

নীলকান্ত এবং তারাপদ উভয়ের চেহারার মধ্যেও অদ্ভুত মিল ; নীলকান্ত : "ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই।" আর তারাপদ : "গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে, বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাহিতেছে।" নীলকান্তর বয়স তারাপদর থেকে একটু বেশি হলেও তাকে চোদ্দ-পনেরর মত বলেই মনে হয়। দুজনের বয়স সামান্য কম-বেশি মনে হওয়া এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও শরীরের অদ্ভুত সাদৃশ্য এ কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, উভয়েই যাত্রাদলের 'ছোকরা'। এই বয়সের যাত্রাশিল্পীর দলে যে কাজ তা মূলত নারীর ভূমিকায় অভিনয় এবং সংগীত পরিবেশন করা। আর নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গেলে সেইসব পুরুষকেই (এখানে কিশোর) দলে নেওয়া হত যাদের মধ্যে অন্তত নারীচরিত্রে অভিনয়ের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। এই কারণেই আমরা দেখি নীলকান্ত এবং তারাপদ উভয়েরই চুল বড় বড় এবং চোখ দুটি ডাগর ডাগর। এই ধরনের যাত্রাদলের ছোকরা দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের ছিল।

যাত্রাদলের ছোকরা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—" বারান্দাজুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোওয়া। ছেলেগুলো লম্বা চুলওয়ালা ; চোখে কালি পড়া ও অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে ; পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে।" যাত্রাদলের ছোকরার চেহারা এমন হওয়ার স্বাভাবিক কারণ, তারা রাতের পর রাত জেগে পালা করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি তা রক্ষিত হয় না। নীলকান্তর একটু বেশি ভোজনপ্রীতি (ভাল খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সু-খাদ্যদ্রব্য পুনঃপুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না) এবং তারাপদর খাওয়ার প্রতি নিরুৎসাহ ('ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে.....') সেটাই প্রমাণ করে। কিন্তু গল্পে তাদের যে শারীরিক বর্ণনা অর্থাৎ একটা ব্রাহ্মণ্য- শ্রী সুলভ লাবণ্য তাদের শরীরে তা বোধহয় গল্পের প্রয়োজনে।

তারাপদ এবং নীলকান্ত উভয়েই রোমান্টিক, সংগীতপ্রেমী, প্রকৃতি মুগ্ধ। তারাপদ এবং নীলকান্ত দু'জনেই যাত্রাদলের দৌলতে গান শিখেছে এবং দুজনেই গান শোনাবার উপযুক্ত শ্রোতা পেয়েছে এবং সেই সংগীত প্রকৃতির নির্জনতাকে আশ্রয় করে শ্রোতৃকূলকে মুগ্ধ করে তুলেছে। নীলকান্ত প্রথম 'নল দময়ন্তী'র পালা পরিবেশন করেছে এক নির্জন দুপুরবেলা কিরণময়ীর কাছে। তারাপদ লবকুশের গান করেছে সন্ধ্যাকালীন নদীবক্ষের নির্জনতায়। উভয়ের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর যে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে তার প্রমাণ আমরা গল্পে পাই। ব্যতিক্রম 'অতিথি' গল্পের শ্রোতা চারুশশী। 'আপদ' গল্পে ঃ "......নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নল দময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত— এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত।" 'অতিথি' গল্পে ঃ তারাপদর গান সম্পর্কে বলা হয়েছে —".....সে লবকুশের পাঁচালী আরম্ভ করিয়াছিল। বাঁশির মত সুমিষ্ট পরিপূর্ণ স্বরে দাশু রায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল......যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘ- নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।" সংগীতই নীলকান্ত এবং তারাপদকে তুলনামূলক ভাবে আরো কাছে নিয়ে এসেছে। 'নল দময়ন্তী' পালায় নীলকান্ত যখন গেয়েছে —

" ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজ বংশে
এমন নৃশংস কেন হলি রে —
বল কী জন্যে, এ অরণ্যে
রাজকন্যের প্রাণ সংশয় করিলি রে—"

তখন নীলকান্তের অন্তর প্রকৃতি যেন উন্মোচিত হয়ে গেছে। স্বভাবতই একটু চঞ্চল প্রকৃতির নীলকান্তের মনটাও কেমন উদাস হয়ে যেত। সে ভুলে যেত মান অপমান, দারিদ্র্যতা। "সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃ-মাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত।"

এই আত্মবিস্মৃতি আমাদের 'অতিথি'গল্পের তারাপদকে মনে করিয়ে দেয়। তারাপদর সংগীতও "সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকালে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত করেছিল।" যার গানে প্রকৃতি আনমনা হয়ে যায়, আর সে গান যে গায় সে যে আনমনা হবেই তা বলাই বাহুল্য।

সংগীত মুগ্ধতার মত প্রকৃতি মুগ্ধতাও জড়িয়ে আছে নীলকান্ত এবং তারাপদ প্রকৃতিতে। উভয়েই প্রকৃতির কোল থেকে এসেছে।। উভয়েরই আবির্ভাবেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে নদী। তবে যেখানে তারাপদ প্রকৃতির অসীমতায় নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছে সেখানে নীলকান্ত সীমার মাঝে অসীমের সাধনা করেছে। বহিরঙ্গগত প্রকৃতি প্রীতির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি তারাপদর সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য নীলকান্ত। তারাপদ সমগ্র প্রকৃতিকে নিজের আত্মায় মেখে নিয়েছে, প্রকৃতিই তার ধ্যানজ্ঞান ঃ "তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের ক্ষেত, গাঢ় শ্যামল আমন ধানের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ ঘন বনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।" 'আপদ' গল্পে বিশ্বপ্রকৃতিও নীলকান্তের অন্তরকে জাগিয়ে তুলেছে। নীলকান্ত নিজেকে 'মানুষ' করে তুলতে লেখাপড়া শিখতে চেয়েছে এবং বাড়ির সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে প্রকৃতির কোলে বই হাতে বসে গেছে। মনে হতে পারে প্রকৃতি উপভোগের চেয়ে 'সে পড়ছে' এই ভাবটি প্রকাশ করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তবুও প্রকৃতিতে যখন "জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখি কিচ-মিচ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না।" ' কী ভাবিত' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। জলের ছল্ ছল্ শব্দ, নৌকার চলে যাওয়া, পাখির কিচির মিচির এইসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নীলকান্তকে বিষয়হীন ভাবনায় প্ররোচিত করেছে।

প্রকৃতির কোল থেকে যেমন একদিন আপদ নীলকান্ত সংসারে এসেছিল ; তেমনি একদিন প্রকৃতির কোলেই ফিরে গেছে। সতীশের দোয়াতদানী চুরিকে কেন্দ্র করে সন্দেহ প্রকাশ এবং স্বদেশে যাবার সময় কিরণময়ীর নীলকান্তকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব যখন বিপুল ঘৃণায় বাতিল করে দিয়েছে, শরৎ সতীশ তখন একদিন ঃ "সেই ব্রাহ্মণ বালকের (নীলকান্ত) কোন উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই, পুলিশ বলিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।" প্রকৃতির কোলেই নীলকান্ত ফিরে গেছে এই কথা আমরা বলছি এই কারণে যে নীলকান্ত কোন ঠিকানা রেখে যায়নি। ঠিকানাহীন মানুষের একমাত্র ঠিকানাইতো বিশ্বপ্রকৃতি। অন্যদিকে 'অতিথি'

গল্পে যখন মতিবাবু তার একমাত্র কন্যা চারুশশীর সঙ্গে তারাপদর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে ফেলেছেন তখন— "স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ বালক আসক্তিবিহীন উদাসী জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।"

(২)

গঙ্গায় নৌকাডুবি হয়ে যাত্রার এক ছোকরা কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে চন্দননগরের বাগানবাড়িতে কিরণময়ীর আশ্রয় লাভ করে এবং তাঁর যত্ন আদরে প্রশ্রয়ে সে ভুলে যায় যে সে চালচুলোহীন এক যাত্রাদলের ছোকরা। কিরণময়ীর স্নেহস্পর্শে সেই ছোকরার নবজন্ম হয়— ভেসে আসা চারাগাছ মাটি পায়। স্নেহসিক্ত নরম মাটিতে সে ডালপালা মেলতে চায়। তার রাগ, অনুরাগ, বিরাগ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি মানবিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হতে থাকে। কিন্তু একদিন বন্যার প্রবল বেগে মাটিতে সদ্য শিকড় বিস্তার করা চারাগাছ ভেসে যায়।

ভেসে আসা আর ভেসে যাওয়া সেই চারাগাছ হল নীলকান্ত ; 'আপদ' গল্প যাকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। 'আপদ' গল্পের নীলকান্তের বিপরীতে আরো একটি কিশোর, যাকে মাটি প্রাণমনে আকর্ষণ করতে চেয়েছে, কিন্তু সেই আক র্ষণ উপেক্ষা করে সে অধরা-মাধুরী উদার অনন্ত প্রকৃতির নিঃসীমতায় নিজেকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। মাটি (অর্থাৎ সংসার) তার কাছে পাখি-ধরা ফাঁদবিশেষ। যেদিন সে টের পেল বিবাহ নামক এক সোনার ফাঁদে তাকে বন্দী করার চেষ্টা হচ্ছে সেদিনই সে উড়ে গেল।

পাখির মতই উড়ে উড়ে প্রকৃতির খুদ খেয়ে বেরিয়েছে তারাপদ। 'অতিথি' গল্পের মূল কথাই হল, সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরানো এক কিশোর।

'আপদ' গল্পের নীলকান্ত এবং 'অতিথি' গল্পের তারাপদ প্রায় সমমুখী চরিত্র হলেও যদি একটু গভীরভাবে অনুভব করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে জন্ম হতেই তারাপদ প্রকৃতি-বালক—"জন্ম নক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।" অর্থাৎ তারাপদর স্বভাবগৃহ বিমুখিতা পূর্ব নির্ধারিত ছিল। আর সেই গৃহ-বিরাগ প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই। একথা স্বীকার করে নিয়েও সেখানে তারাপদ এবং নীলকান্ত সাধারণ কিশোর, সাধারণ ব্রাহ্মণ, সাধারণ যাত্রাদলের ছোকরা সেখানেও উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য প্রকট।

নীলকান্ত এবং তারাপদ উভয়েই ঘটনাক্রমে দুটি ধনী পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু শরৎ-কিরণময়ীর সংসারে প্রথমে নীলকান্ত যেভাবে আপ্যায়িত হয়েছিল অচিরেই তার ব্যতিক্রম ঘটতে লাগল। এই ব্যতিক্রমের কারণ, প্রথমত, প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ স্বদেশে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব কিরণময়ীকে এই ছেলেটির বাৎসল্য-সান্নিধ্য দিয়ে কিছুদিন আটকে রাখা। দ্বিতীয়ত, নীলকান্ত ইতিমধ্যেই শরৎ, তার মা এবং পাড়ার সকলের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিল। এই বিরাগের কারণ—"নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়-গুড়িতে ফড় ফড় শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল।"

"নীলকান্তের চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্ত শিশু সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবকাশ পাইল না।" নীলকান্তের এই অধঃপতনের জন্য অবশ্য কিরণময়ীর প্রশ্রয় কিছুটা দায়ী ছিল। "কিরণ এই ছেলেটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন......শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নতুন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন।"

অন্যদিকে তারাপদর শারীরিক বর্ণনার মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়— "যেন সে পূর্বজন্মে তাপস বালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।" এছাড়াও তারাপদর সাংসারিক কাজ— মাছ কোটা, দক্ষতার সঙ্গে রান্না করা, তার শুভ্র কাপড়, বিলম্বিত পৈতার উপস্থিতি সবকিছুর মধ্যেই যেন একটা শান্ত-স্নিগ্ধ-সমাহিত ভাব। তবে মাতৃস্নেহ এবং ভাই-বোনের কথায় তার সীমাহীন ঔদাসীন্য আমাদের অবাক করে। তারাপদ কেন তার মাকে ছেড়ে চলে এসেছে অন্নপূর্ণা জানতে চাইলে সে বলেছে— "তাঁর আরো চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।" বলা বাহুল্য, তারাপদর যা বয়স তাতে মা-ভাই-বোন সম্পর্কে এমন দার্শনিক-সুলভ নির্লিপ্ততা আমাদের অভ্যস্ত বিশ্বাসে ধাক্কা দেয় । নীলকান্তকে সেক্ষেত্রে অনেক বেশি জীবন্ত মনে হয়। তারাপদ জীবনবিলাসী। জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম সে পালন করেনি। মাকে ছেড়ে এসেও সে এক মাতৃস্থানীয়াকে পেয়েছিল। অন্যভাবে নারীকেও পেয়েছিল— চারুশশী তার কাছে নারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারাপদ তাকে আবিষ্কার করতে পারেনি। কিংবা বলা যায় আবিষ্কার করার জন্য দু'বছর সময় পেয়েও, চারুকে নারী মনস্তত্ত্বের দীর্ঘপথ হাঁটিয়েও একদিন তাকে ফেলে সে পথেই বেরিয়ে গেল। তারাপদ নদী ভালবাসলেও নিজে নদী হতে পারেনি, সে 'পথ' হয়ে থাকল— সে 'পথ' চালনা করে কিন্তু নিজে চলে না। তারাপদ প্রবর্তিত সেই পথে চারুশশী যাতায়াত শুরু করেছিল, তা না হলে—"সে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষভারে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্‌বেগ কেন (তারাপদর অধিকার নিয়ে সোনামণির সঙ্গে দ্বৈরথ প্রসঙ্গে)।" শুধু তাই নয়, তারাপদকে কেন্দ্র করে সোনামণির সঙ্গে চারুর আড়ি হয়ে যাওয়া এবং তারাপদর প্রতি একাধিপত্য কায়েমে হিংসাত্মক হয়ে ওঠার মধ্যেও চারুর হৃদয়ের উন্মোচন ঘটেছে। তারাপদ

সোনামণিকে বাঁশিতে কীর্তনের সুর শুনিয়েছে এই সংবাদে ক্রুদ্ধ চারু তারাপদর বাঁশিটিকে নির্মমভাবে ভেঙেছে। তারাপদ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে—"চারু রক্তনেত্রে রক্তিম মুখে 'বেশ করেছি, খুব করেছি' বলিয়া আরো বার দুই-চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।" ধ্বংসকারিণীর উচ্ছ্বসিত কান্না! বিষয়টি নিঃসন্দেহে অর্থবহ। নারীর এ-হেন কান্নায় অপরিপুষ্ট কিশোরহৃদয়ও যে পরিণত হয়ে ওঠে তা তারাপদতে দেখা যায়। "চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।" এইখানে তারাপদ ভাগ্যবান। সার্থক।

অন্যদিকে নীলকান্ত "যাত্রাদলের ছোকরার অপেক্ষা অধিককিছু" হয়ে উঠতে পারল না। কিন্তু সে চেষ্টা করেছিল। সখী সেজে সতীশকে খুশি করবার কিরণময়ীর প্রস্তাব সে কৌশলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে লেখাপড়া শেখার চেষ্টা করেছিল। প্রসঙ্গত, নীলকান্তকে কিরণময়ী ভালবাসলেও কোথাও যেন একটু অন্যমনস্কতা ছিল। তা না হলে নীলকান্তের প্রায় সমবয়সী সতীশের মনোরঞ্জনের জন্য নীলকান্তকে সখী সাজতে বলত না ; এটা যে যেকোন পুরুষেরই পৌরুষে আঘাত করবে কিরণময়ীর তা বোঝা উচিৎ ছিল। অথবা চালচুলোহীন নীলকান্তর স্নেহ-বুভুক্ষ-মন একটু বেশি দাবী করে ফেলেছিল। সে কারণেই গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে কিরণময়ীর অনুপস্থিতিতে নীলকান্তের খাওয়া হত না। মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে নীলকান্ত কিরণময়ীর সান্নিধ্য প্রার্থনা করত,অভিমান করত এবং সেই অভিমানের মূল্য না পেয়ে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কাঁদত ঃ"কিন্তু আজকাল কিরণ ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত ; না খাইয়া উঠিয়া পড়িত......মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন এবং খাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, 'আমার ক্ষুধা নাই'। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদ দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না।" অভিমানীর অভিমান যদি গুরুত্ব না পায় তার থেকে বালাই আর কিছু নেই। নীলকান্ত এইভাবেই প্রতি পদে পদে বিড়ম্বিত হয়েছে। অথচ একই রকম খাওয়ার ঘটনায় তারাপদ রাজাধিরাজ। তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে প্রাণবন্ত সংসার। সোনামণিদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে চারু তারাপদকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে খাওয়ার সময় তার বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। "কিন্তু তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সানুনয়ে বারংবার বলিতে লাগিল, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।' তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল।"

সত্যিই নীলকান্ত হতভাগ্য। তারাপদ শুধু প্রকৃতিকে দেখে মুগ্ধই হয়নি, সে প্রকৃতিকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। আর নীলকান্ত কেবলই কেঁদেছে। তারাপদ সেখানে কৃষ্ণের মত বৃন্দাবনকে কাঁদিয়ে 'মথুরায়' চলে গেছে। নীলকান্ত সেখানে পার্থিব চুরির অপবাদ নিয়ে সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেছে। তারাপদও 'চোর', নীলকান্তও 'চোর'— তারাপদর চুরিতে দীর্ঘশ্বাস, আর নীলকান্তের চুরিতে খানাতল্লাশির প্রস্তাব —'এইবার নীলকান্তের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।'

'আপদ' গল্পের নীলকান্ত এবং 'অতিথি' গল্পের তারাপদর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুটি সত্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এবং তা চাইতে গিয়ে তিনি যেন তারাপদর প্রতি একটু বেশি পক্ষপাত দেখিয়ে ফেলেছেন, এর কারণ কি রবীন্দ্রনাথ তারাপদর মধ্যদিয়ে নিজের দেওয়াল-বন্দী অতৃপ্ত কৈশোরকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন! কারণ তিনি লিখেছেন— 'বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত। অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার জানলার নানা ফাঁকফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত।'

তবে রবীন্দ্রনাথ তারাপদকে প্রকৃতির কোলে বিচরণরত হরিণশিশু করে আঁকলেও নীলকান্তকেও একেবারে বিমুখ করেননি। বরঞ্চ বলা যায়, নীলকন্ঠ প্রকৃতি এবং সংসার দুটিরই রস আকণ্ঠ পান করতে চেয়েছে। আর তারাপদ সংসারের মাঝে রাজহাঁস হয়ে থেকেছে। প্রকৃতিকেও সে আকণ্ঠ পান করতে পেরেছে কি ? পারলে চারুশশীকে সে উপেক্ষা করল কেমন করে ? 'চারু-প্রকৃতি'কে বাদ দিয়ে তারাপদর এ কেমন প্রকৃতি মুগ্ধতা!

তথ্য সন্ধান ঃ

১। গল্পগুচ্ছ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। জীবনস্মৃতি — ঐ
৩। সঞ্চয়িতা — ঐ
৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)— ডঃ সুকুমার সেন
৫। কথাকোবিদ্ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৬। বাংলা ছোটগল্প — শিশির কুমার দাশ
৭। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ
৮। 'জগৎ দেখিতে হইব বাহির'— শ্রী প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথ— পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রকাশনা।

ধারাবাহিক

উপলখন্ড

এক বীরাঙ্গনা বোনের কথা

অরুণ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৭১ সন নির্বাচন হচ্ছে। সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আমি নির্বাচন প্রার্থী। সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি আই (এম) কখনও প্রার্থী দেয়নি। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থী দিয়েছিল ১৯৫৭ সনে। কমরেড টুরকু হাঁসদা দ্বি-আসনযুক্ত সিউড়ি-মহম্মদবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন। সেবার কংগ্রেস বিরোধী মোর্চা হয়েছিল। কৃষক-মজদুর প্রজাপার্টির সাথে। মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ঐ দলের প্রার্থী। সাধারণ আসনে তিনি। আর উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কমরেড টুরকু হাঁসদা। প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসী রাষ্ট্রমন্ত্রী গোপিকা বিলাস সেনগুপ্ত এবং ভূষণ হাঁসদা। দু'জনেই তখন বর্তমান সদস্য ছিলেন।

১৯৬২ সনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সিউড়ি কেন্দ্রে সমর্থন করেছিল সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের আর এস পি প্রার্থী সুধীরকুমার ঘোষমশাইকে। তিনি প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কাটোয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন। সাতান্নতে কী করেছিলেন ঠিক মনে নেই। তবে, একটা কেউকেটা হবার প্রবল বাসনা ছিল অন্তরে। কিন্তু সে বাসনার কুঁড়ি ফুটল না। পরবর্তীকালে গাই-বাছুরের দলে নাম লেখালেন তিনি। ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা হয়েই থেকে গেলেন। বাট পেলেন না। পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির বীরভূম জেলা শাখার সম্পাদক হয়েছিলেন একবার। তবে, বীরভূমের প্রধান শিক্ষকরা ঐ দুইনম্বরী সংগঠনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাত্তা দেননি। আজ তো ঐ সংগঠন এ জেলায় মৃত সংগঠন। ভবিষ্যতেও পুনর্জীবনের সম্ভাবনা কম।

১৯৬৭ সনে এস ইউ সি'র সাথে সি পি আই (এম)-এর নির্বাচনী ঐক্য ছিল। 'উলফ'। ইউনাইটেড লেফ্‌ট ফ্রন্ট। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট। সিউড়ি কেন্দ্রে ঐ ফ্রন্টের প্রার্থী এস ইউ সি'র প্রতিভা মুখার্জি। লেপেট গাড়ি। মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী শিল্পপতি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৭তে তিনি লাভপুর-নানুর কেন্দ্রে হারলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ডাঃ রাধানাথ চট্টরাজের কাছে। ১৯৬২তে সিউড়ি-মহম্মদবাজার কেন্দ্রে বিজয়ী হলেন। ১৯৬৭তেও তিনি জিতলেন এই কেন্দ্রে। তখন মহম্মদবাজার আলাদা কেন্দ্র। উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত আসন বীরভূমে আর রইলো না। ১৯৬৬ সনে ডিলিমিটেশনের সভা হলো দুর্গাপুরে। অনেক লড়ালড়ি করলাম ঐ সংরক্ষণের জন্য। ব্যর্থ হলাম।

১৯৬৯ সনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী প্রতিভা মুখার্জি। জিতলেন। সড়ক দপ্তরের উপমন্ত্রী হলেন। ১৯৭১ সনে যুক্তফ্রন্ট রইলো না। সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট। এস ইউ সি তার বাইরে। ঐ দলের নেতারা যুক্তফ্রন্ট ভাঙার অন্যতম আড়কাঠির কাজ করলেন। ১৯৭১ সনে তাই আমরা একা লড়লাম।

রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত। খুন-জখম চলছে। কে দাঁড়াবে? কেউ রাজী নন। আমি মাথা পেতে নিলাম ঐ দুর্বহ ভার। পরাজয় সুনিশ্চিত। পার্টির সংগঠন বলতে নগরী, চিনপাই অঞ্চলের সগড় ও তার আশেপাশের কিছু, ইক্‌ড়া আর সিউড়িতে কিছু, খটঙ্গায় নতুন করে সংগঠন করেছি। প্রকৃতপক্ষে আর কোথাও কিছু নেই। স্রেফ কিছু কাটাক্ট। তার বেশি কিছু নয়। তবু, লড়তে হবে কাস্তে-হাতুড়ি-তারার প্রতীক সিউড়ি কেন্দ্রের ভোটারদের চেনাতে হবে। তাছাড়া, লোকসভায় বীরভূম তপশিলী সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী গদাধর সাহা। পার্লামেন্টেও এই আসনে আমরা প্রথম লড়ছি। তার আগে কাটোয়া কেন্দ্রে কমরেড ডাঃ শরদীশ রায় জিতেছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হয়ে। ১৯৬৭তে বোলপুর কেন্দ্রে তিনি হেরে যান। তারপর থেকে ১৯৮৪ সন পর্যন্ত তিনি অপরাজেয়। এরপর থেকে সোমনাথ চ্যাটার্জিও অপরাজেয়।

নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বদিন খুন হলেন কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী যদুগোপাল রায়। ১৯৫৭ পর্যন্ত ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী। তবে, জেলায় নয়,

হুগলীর শ্রীরামপুরে। ওঁর কাকা ছিলেন হুগলীর ডি এস পি, পুলিস অফিসার। শ্রীরামপুরে থাকতেন। উনিও সেখানে থাকতেন। আমার হুগলীর রাজনৈতিক জীবনে উনি ছিলেন বিশেষ পরিচিত। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সাথেই ওঁর ওঠাবসা ছিল। ১৯৫০ সনে আমার নেতৃত্বে যখন উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম চলছে, পুলিসের ওয়ারেন্ট মাথায় নিয়ে আমি শ্রীরামপুরের মাহেশে আন্দোলন সংগঠিত করছি, তখন তিনি আমার অন্যতম সহায়ক সহকর্মী, অন্তত সমর্থক ছিলেন সে লড়াইয়ের। উনি বীরভূমে এলেন উনিশশো চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন সনে। স্বগ্রাম চোরমুড়ায়। ঐ সময়ে বিয়েও করলেন। শ্বশুরবাড়ি মুর্শিদাবাদের গুড়ো কি পাশলা। কমরেড গোলোকপতি রায়ের গ্রামে।

তিনি সন্ধ্যাবেলা খুন হলেন। ঐদিনই দুপুরবেলায় চোরমুড়ায় আমি দেখা করতে যাই। দাদা-বৌদি দু'জনকেই বললাম, ভোট দেবেন তো আমাকে। যদুগোপাল রায় অকাতরে বললেন, তুমি জয়ী হও। বৌদিকে বললাম, দাদাকে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন। কারণটাও বললাম। ওঁকে সাবধান করার জন্যই আমি চোরমুড়ায় গিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কিছু হলো না। সন্ধ্যাবেলা সিউড়িতে পার্টি অফিসে বসেই খবর পেলাম ঐ ঘটনার। গেলাম সেখানে। ওঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ মাটিতে শায়িত। আমার দীর্ঘদিনের (১৯৪৭ থেকে ১৯৭১) পরিচিত এক রাজনৈতিক কর্মী এবং এককালে বামপন্থী হিসাবে সহকর্মীর ঐ মৃত্যু ব্যথিত করল। রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ল, কে খুন করল? সে প্রশ্নের উত্তর আছে মহাকরণের স্বরাষ্ট্রদপ্তরে রক্ষিত এক গোপন ফাইলে। জানি না, সে ফাইল আছে কি না। তবে, ১৯৭২-এর পরে পুলিসের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে সুব্রত মুখার্জি নিজে এসে এস পি অমিয় সামন্তের কাছ থেকে সে ফাইল নিয়ে চলে যান। সুন্দ-উপসুন্দের লড়াইয়ের কথা আছে তাতে। যতদূর জানি, প্রকৃত হত্যাকারী এক ঘোষনন্দন দিল্লিতে এক কংগ্রেসী এম পি'র বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকত।

নির্ধারিত দিনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন সিউড়ির উকিল সুনীতি চট্টরাজ।

নির্বাচনী প্রচারকার্য শুরু হলো। ক'দিন পরেই বাঁশশঙ্কা গ্রাম থেকে নির্বাচনী প্রচারের কাজ শেষ করে ফিরে আসার পথে আমার উপর আক্রমণ হলো। ঐ গ্রামে কংগ্রেস-ভক্ত পঞ্চানন পাইনের বাড়িতে ভোট দেবার আবেদন জানাতে গিয়েছিলাম। তাঁর পুত্র সিউড়িতে এসে কমরেড শরদীশ রায়কে বললেন যে, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্তরা নাকি আমাকে ভোট দেবেন। কিন্তু আমাকে তো ভোট চাইতে হবে। শরদীশবাবুর তাগিদে গেলাম সেখানে। তারপর ঐ ঘটনা। আমি যাবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী সদলবলে হাজির হলেন। নন্দী-ভৃঙ্গিরা প্রায় সবাই ঐ প্রার্থীর সাথে ছিলেন এবং সশস্ত্র তারা। আমি একা এবং নিরস্ত্র। তখনও সিকিউরিটি নেইনি। জীপ গাড়িতে ফিরছিলাম। ওর চালক হারু মালের অসম সাহসিকতা ও তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা পেল।

এবার দ্বিতীয় ধাক্কা। ভোট কাছাকাছি এসে গিয়েছে। সিউড়িতে আবেদন জানানো হয়নি। বেণীমাধব স্কুলের শিক্ষক অনিল দাসকে নিয়ে পদব্রজে গেলাম শহরের দশ নম্বর ওয়ার্ডে। সিনেমা হলের (বীরভূম টকিজ) কাছাকাছি যেতেই বুঝলাম শত্রুরা তৈরি। দ্রুতপায়ে হাঁটলাম লালকুঠী পাড়ার দিকে। আমরা যেদিক দিয়ে যাচ্ছি, তার অপরদিক দিয়ে এক কংশাল আরও দ্রুতপায়ে আমার সামনে হাজির। বা-পাশে একটা খোলা দরজা পেলাম, ঢুকলাম সেখানে। কার বাড়ি জানি না। কী হবে তাও জানি না। প্রাণ বাঁচানোই মূল প্রশ্ন। আততায়ী বোমা হাতে সামনে। ওর হাতের বোমায় ঘরের দরজাটা ফেটে গেল। আমাকে তখন এক তরুণী বধূ হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ঢুকিয়েছেন ওঁর রান্নাঘরে। শিকল এঁটেছেন। আর নিজে হাতে নিয়েছেন একখানা বটি। ওঁর তখন রণরঙ্গিনী মূর্তি। পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন এক ভদ্রলোক। পরিচিত। ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টের কেরাণী। তিনি এসেই বললেন, আপনি চলে যান। আমাদের বিপদ হবে। তরুণী বধূ গর্জে উঠলেন, ওকে আমি যেতে দেব না। আমাকে হুকুমের সুরে বললেন, খবরদার রান্নাঘর থেকে বেরুবেন না। আমি আছি, আমার হাতের এই ধারালো বটি আছে। যতক্ষণ পারি, যুজ্‌ব। আপনার ভয় নেই।

একি অভয়বাণী? কে তুমি বোন? আমি তো তখনও চিনি না তোমাকে। দেখলাম তোমার বীরাঙ্গনা মূর্তি। কিন্তু কে? ভীতসন্ত্রস্ত কেরাণীবাবু বললেন, এটা কে জি ও রঞ্জিৎ দত্তের বাড়ি। রঞ্জিৎ দত্ত আমার বিশেষ পরিচিত। বিশেষ 'সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। তাঁর বাড়ি? এ কী কাকতালীয় ঘটনা?

আধঘন্টা পরে সিউড়ি থানার মেজবাবু এলেন আমাকে উদ্ধার করতে। চলে গেলাম। পিছনে রেখে গেলাম আমার এই প্রাণদাত্রীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা।

ভোটপর্বের শেষে একদিন রঞ্জিৎবাবুকে জানিয়ে গেলাম তাঁর বাড়ি। আমার বীরাঙ্গনা বোনকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য

যাবার উদ্দেশে। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে এলাম। এরপর রঞ্জিৎ দত্ত বদলি হয়ে গেলেন। আর জীবনে ওঁদের সাথে আমার দেখা হয়নি। কোথায় আছেন ওঁরা জানি না। তখন বাঁকুড়া থেকে এসেছিলেন। তবে, সম্ভবত বঙ্গজ। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে খোঁজ করে জেনেছিলাম যে উনি ঐ দপ্তর থেকে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরে ফিরে গেছেন। তারপর কোথায় গেছেন, ওঁদের জানা নেই।

ওঁরা যেখানেই থাকুন আমি আজও শ্রদ্ধার ডালি বহন করে চলেছি। ঐ বীরাঙ্গনার নামও মনে নেই। তখন জিজ্ঞেসও করিনি। ওঁর কথা কাউকে কাউকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছি। লিখবও ভেবেছি কয়েকবার। আজ সে দায়িত্ব পালন করে মনটা হাল্‌কা হলো।

একাত্তর-বাহাত্তরে কংশাল ও নকশালদের তৈরি সন্ত্রাসের সময় এরকম কত বীরাঙ্গনা কমিউনিস্টদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই উপলক্ষে তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমার এক আত্মীয়া ভগ্নীসমা, বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণার সি পি আই (এম) নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের মা ভারতী ভট্টাচার্য (ডাকনাম মাম্‌নি) তাঁদের একজন। এরকম আরও অনেকে আছেন।

(চলবে)

কবিতাগুচ্ছ

ধ্বংসস্তূপে শিশু

(সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ অথবা ভূমিকম্পে আক্রান্ত শিশুদের জন্য রচিত)

সুনীল কর্মকার, সহ-প্রধান শিক্ষক
পাঁচড়া উচ্চবিদ্যালয়, বীরভূম

ঠিক এরকমই হাত,
রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত হাত,
পৃথিবীতে বার বার উঠে এসে —
কী যেন বলে যায়.......!

কখনও ইন্দোনেশিয়া কখনও ভেনেজুয়েলা
কখনও ইরাক কিংবা প্যালেস্টাইন
কিংবা এশিয়ার প্রশান্ত বুকের থেকে —
উঠে আসে কচি-কচি হাত অথবা মুখ;
অথবা হাতও নয় — মুখও নয়
একটি লাশ!

রাস্তায় — পার্কের সবুজে,
অথবা নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে —
চওড়া বুকের থেকে —
খুবলে নিয়ে যায়
বাজপাখির ইস্পাত ঠোঁটে।
টুকরো-টুকরো হয় —
স্বপ্ন দেখা রূপোলি নরম শিশির বিন্দু।

ঠিক এরকমই হাত উঠে এসে
সভ্যতার অহমিকার পর্দাকে ঠেলে সরিয়ে
উলঙ্গ ক'রে —
আমাদেরকে নূতন ক'রে প্রাগৈতিহাসিক
আদিমতার অন্য এক —
পৃথিবীকে চিহ্নিত ক'রে যায়।

এরকম কচি-কচি নরম হাত
পবিত্র নির্মল পৃথিবীর স্পর্শ
সজীব-শুভ্রতার ভবিষ্যৎ
উঠে এসে ভিক্ষা চায়;
বাঁচার জন্য ভিক্ষা —
দু'ফোঁটা জলের জন্য ভিক্ষা,
যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির ভিক্ষা!

ঐ দু'টি হাত —
বিধ্বস্ত ইট-কাঠের ভেতর থেকে
উত্তাল সমুদ্র থেকে উঠে এসে
বারুদের তীব্র বিষে দগ্ধ হ'য়ে —
আমাদেরকে আলো দিয়ে যায়,
আমাদেরকে ভাষা দিয়ে যায়,
রক্ত মৃত্যুর স্তূপ থেকে
অন্য কিছু বলে যায়।।

দৃশ্যপট

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সহ-শিক্ষক
বাইনান বামনদাস উচ্চবিদ্যালয়, হাওড়া

জোছনা-হাসিতে ঝরণা
আকাশ ভুলেছে কান্না
মাটিতে ঢেউ-এর ঘা
একটু, শব্দ করে না।

দুখ ছাওয়া মাটি ঘর
শোনে না অন্ন-স্বর
কঙ্কাল ঘাটে লীন
উনানে আঁচ ক্ষীণ।

সাজছে তিলোত্তমা
তাই, দৃষ্টি পড়ে না
অন্নহীন ছেঁড়া জামা
আমাদের লজ্জা করে না।

চাঁদের ওপারে অন্ধকার
নিশ্চুপ হাহাকার
ভাঙন-ক্ষুধায় অস্থির
কাঁপছে পাতা-নীড়।

একেক সময়..... মানুষ

হীরেন পাল, সহ-শিক্ষক
রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়, বাঁকুড়া

একেক সময় থোড়ে বসা ধানের মত নিজস্ব ব্যস্ততায়
মানুষ ফুলে ওঠে ফেঁপে ওঠে
অবিরত চেনামুখ ও বড় বেশী অচেনার অন্ধকারে
হারিয়ে যায়
পুরনো প্রেম, ভালবাসা-বাসি মুহূর্তে বড় বেশী ধূসর মলিন
পাটে বসা সূর্যের মত ক্রমশ ম্লান অস্পষ্ট একাকার।

একেক সময় মানুষের অসহ্য অহংকার
শীতের ঘন কুয়াশার মত
পৃথিবীকে যেন আমূল অস্থির করে তুলে
একেক সময় টুকরো টুকরো বাসি রুটির মত ছুঁড়ে দেয়
ঘৃণা আর অবজ্ঞা
ওই অসহায় আর্ত মানুষের দিকে......।

এইসব ভুলে এসো...... একেক সময়
শপথ নিই আমরা, যে কোন সময়ে..... যে কোন মূল্যে
আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে
মানুষের সেবায় মানুষের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিই
অন্তত আর একবার
শস্যে শ্যামলে সহানুভূতির ঘাম তেল দিয়ে
এই স্বপ্নময় পৃথিবীকে সুষমায় ও সৌরভে অনিন্দ্যসুন্দর করি।

আগুনের ফুলঝুরি

গোলাম হোসেন, উত্তর ২৪ পরগণা

মানুষ কি মানসিক প্রতিবন্ধী হল!
এমন অসংলগ্ন মন পেল সে কোথায়
স্বাভাবিকতায় স্বতন্ত্র মন
কোথায় খোয়ালো সে?

দেওয়া ও নেওয়ার এ সংসারে
বুনো পাহাড়ী ছবি ভেসে ওঠে
অন্ধকার ছায়াময় দিগন্তরেখায়।

একই দ্বীপে বসবাস তবুও এ দ্বীপান্তর
অবান্তর আত্মপ্রবঞ্চনা অলৌকিক দুর্বহ
কেন তবে মানুষের ছলনা এ খেলা।

জীবনের উৎসব আঙিনার সুচির আবরণ
আকাশের ওই সুনীল সামিয়ানায়
কারা ওরা ছুটে গিয়ে আগুন ধরায়!

মানবতা খুন করে খুনীরা পালায়
মানসিক প্রতিবন্ধী কেন খেলে
আগুনের এই ফুলঝুরি খেলা।

বই

দিলীপ মিত্র, *হাওড়া*

বুকের পাঁজর গুনছে সময়!
বই বুকের উপরে।
বইও কি মানুষের মত, কথা বলে?
খাদ্য চাই, পানীয় জল চাই,
আহার ও বাসস্থানের নিশ্চিত উত্তর।
উইপোকারা, কুরে কুরে খেয়েছে,
বই-এর রক্ত মাংস।
বই, সাদা হাড় এখন।
ভাতের মত সাদা রং।
অন্ধকার রাত্রি পার হয়ে,
বই, সকালের রোদকে বলছে,
তোমরা যারা রৌদ্রের প্রত্যাশা করো,
তারা পড়ো আমার বুকের,
হাড় বের হয়ে থাকা, বই-এর অক্ষর।

কেন

শংকর কর্মকার, শিক্ষক
মথুরাপুর বি এস এস হাইস্কুল, মালদা

সত্যি বলছি, পারলাম না ওদের মতো
হিংস্র হতে।
রক্তাক্ত হাত দুখানি যখনি আমায় ছুঁয়ে নিথর হয়ে এল,
আমি তখন খুবই ছোট।
জানো, তখন আমি বুঝতেও পারলাম না
ছিঁড়ে গেল স্নেহের বাঁধনখানি।
তেইশ-এ পা রাখতে গিয়ে হঠাৎ স্মৃতিতে এল,
সেই বিভীষিকাময় রাত।
বাবার পাঞ্জাবীটা লাল হতেই, মায়ের আর্তনাদে

আমি চেয়ে দেখি,
তছনছ হয়ে যাচ্ছে আমাদের ছোট্ট কুটির।
শিউরে উঠি ভয়ে,
কালো কাপড়ে বাঁধা মুখগুলি আবছা হলেও,
ভাসে শুধু চোখগুলি।
আজ চোখে জল এলেও ভাবি,
বেশ ভালো আছি,
১৫০ বছরের অতীতকে সাথে নিয়ে
একাই পথ চলেছি।

দেখা হবে না

রবীন্দ্রনাথ দাস, শিক্ষক
সন্তোষকুমারী শিক্ষানিকেতন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

এখনো এই বুকে দাউ দাউ আগুন

কেননা
এখনো নষ্টামি ধাষ্টামির শেষ নেই
এখনো যখন তখন চুরি হয়ে যাচ্ছে
মানুষের সুখ শান্তি ভালোবাসা
রাতবিরেতে লুঠ হচ্ছে কষ্টের ফসল
দুঃশাসনের অসহ্য দাপাদাপিতে
ভেঙেচুরে যাচ্ছে
তিল তিল গড়া স্বপ্নের সংসার

এখনো অনেক রক্তঘর্মপাত অনিঃশেষ যুদ্ধ
এখনো অতন্দ্রপ্রহরী দুর্গচূড়ায় জেগে থাকা
আর মানুষের কানে কানে মহামন্ত্র
ওঠো জাগো
কর শত্রুহনন

নইলে
কিছুতেই নয় অবসান এই নিকষ কালোরাত
নয় সূর্যোদয় জীবন আকাশে
ছড়াবে না খুশির রোদ্দুর দিকে দিকে
ফুটবে না প্রিয় সূর্যমুখী সাধের বাগানে
আর জীবনের গানে গানে
মুখর হবে না স্বপ্নের পৃথিবী দুই চোখ মেলে

চিরন্তন

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষক
হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, উত্তর ২৪ পরগণা

কত অন্বেষণহীন বেলা, গাঢ় দিন —
কাদা মাখা পথ ঘুরে ফিরে যায়।
গ্রাম্যপাঠ, কাঁথার প্রাচীন তন্তু দীর্ঘকথার মত জেগে থাকে
অপার আকাঙ্ক্ষা বুঝি!
তার খোঁজ দিগন্তের শেষ মাঠে রাখাল বালকও
ভুলে যায়।
সামনের জলে পোষা পাতিহাঁস আর কলমিলতা
পাতার চিত্রিত ডোঙা নানা স্রোত বেয়ে চলে যায়
সীমাহীন দেশে.....

আশ্রয় ছায়াটি বেঁধে বড় সাধে — আঁচলের কোণে
তার হাতে ফিঁকে রোদ
ধানসেদ্ধ প্রহর সজাগ।

একান্ত পেছল পায়ে সে কিন্তু সন্ধ্যা জ্বালে,
শাঁখ বাজায় এখনও আশায় —
নিরিবিলি তুলসীতলায়।

স্বপ্নের ভিতর গড়িয়ে চলে নদী

কানাইলাল বিশ্বাস, সহ-শিক্ষক
গড়াইমারী জে কে বিদ্যানিকেতন, মুর্শিদাবাদ

জোছনার থালাভর্তি ফুরফুরে শাদা ভাত
স্বপ্নের ভিতর গড়িয়ে চলে নদী

কখনো
মেঘেরা এসে হাত রাখে শিয়রে
ঘুম ভাঙাতে
সামনে লোনাজলে ভেজা পথ......

পশুচর্বি মাখা অতীত রাত্রির যত স্মৃতি
বিদ্যুৎবহ্নির মত ঝরে পড়ুক
শক্ত করোটিতে
সময়ের ঘোলাজল ঠেলে
বর্ষার কোন এক বিধবা বিকালে
ভরিয়ে তোল শূন্য থেকে শ্মশান
মিছিলে মিছিলে।

ব্রত

অভিজিৎ দাশগুপ্ত, বর্ধমান

বাজে শাঁখ, সমুদ্র, এই নোনাস্বাদ
হাওয়া বাড়ে, ঢেউ বাড়ে, ভেতরে আবাদ
ফসলের অঙ্গীকারে মাটির সংলাপ
অনুভবে সমন্বয়, মিলনের স্বাদ।

আন্তরিক ভালবাসা, অন্তর্লীন গান
বন্ধু, তুমি অন্তরে, তুমি শাশ্বত
বাইরে ঘরে প্রজ্জ্বলিত প্রাণের প্রদীপ
চিরন্তন, শস্যময়, জীবনের ব্রত।

সমন্বয়ে সঞ্চারিত নতুন সকাল
আলোকিত প্রতীক্ষায় মেঘমল্লার
সূর্যমুখী বন্ধনে, পরিপূর্ণময়.......
পরিচয়ে, সঞ্চয়ে, খুলেছে দুয়ার।।

কেউ বলে না মানুষ হতে

সমীরকুমার হাজরা, প্রধান শিক্ষক
কামারহাটী সাগর দত্ত ফ্রি হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগণা

কেউ বলে না মানুষ হতে, সবাই বলেন ডাক্তার।
বাবা অঙ্কে শূন্য পেলে, দাদু করেছেন মাফ্ তার।
দাদাই-এর মোর চরম শখ, ইঞ্জিনিয়ার হলে,
দিদিমা তো চেয়েই থাকেন, শিশু পাইলট বলে।
কাকার আমার চরম শাসন, হতেই হবে সৌরভ,
শুধু তোর নয় পাড়াখানার, বেড়েই যাবে গৌরব।
দিদির আমার মিষ্টি শাসন, ভাই গায়ক হবে,
হারমোনিয়াম তানপুরাতে শখ মিটবে তবে।
বাবার আমার চরম আশা প্রথম হওয়া চাই।
মায়ের কেবল শ্যেনদৃষ্টি মন্ত্রীসভায় যাই।
আমি কেবল খেলা করি, আর কিছু না চাই,
মাকে প্রণাম করে শুধু বিদ্যালয়ে যাই,
বলি মাগো — ঐ ওজনটা তোমার কাঁধেই নাও,
আমায় কেবল বড় কর, মানুষ হতে দাও।

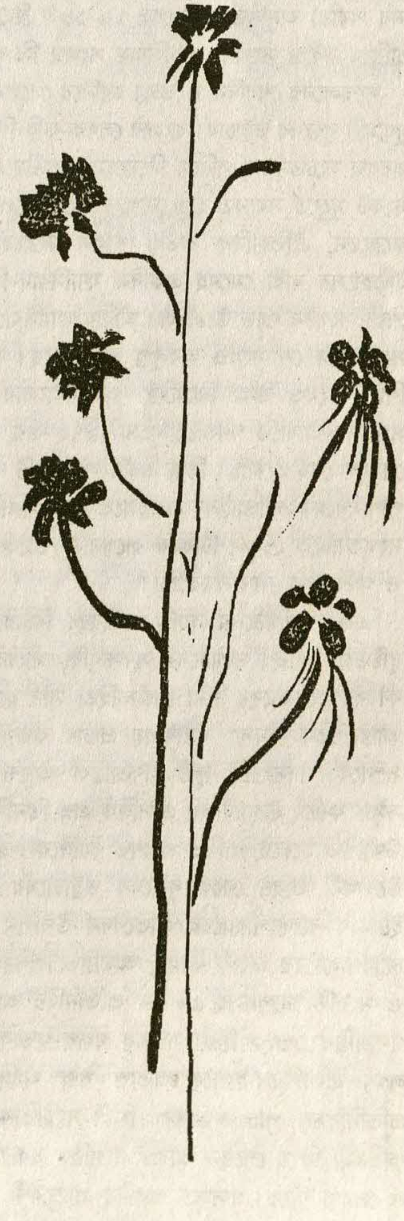
নেতাজী স্মরণে

প্রসেনজিৎ রায়, সহ-শিক্ষক
নন্দকুমারপুর উচ্চবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪পরগণা

কী বললেন ওটেনসাহেব!
অপমানের নেই কো ক্ষমা
পরাধীনের বুকের মাঝে।
হাজার কণা বারুদ জমা।
বারুদ জমে, বারুদ জমে—
লক্ষ ছাত্র-যুবর মনে,
জনমনের অধিনায়ক
কোন্ সুজনের আহ্বানে?
লাখ লড়াকুর হৃদ্‌পিন্ডে
কার সে স্লোগান মাতন জাগায়?
নিশ্চয়তার ভবিষ্যতে
হাজার তরুণ আগুন লাগায়—
কার ডাকেতে লাখ ফৌজি
রেখেছিলেন জীবন বাজি?
সশ্রদ্ধায় স্মরণ করি—
চিরতরুণ বীর নেতাজী।
স্বপ্নপূরণ হয়নি কো হায়,
দেশ ধুঁকছে সর্বনাশে
বিক্রি হয়ে যায় জননী
বিশ্বায়নের করাল গ্রাসে।
সংস্কৃতির বস্ত্রহরণ—
মুক্তবাজার হাটের মাঝে—
স্বার্থবাদী বিঘ্ন বিপদ
বিষম বাধা দেশের কাজে।
হাল ছেড়ে কি থাকবে বসে
আজ গুটিকয় কাজের কাজী?
কক্ষনো নয় সম্ভব তা—
বুকের মাঝে বীর নেতাজী।

খুঁজে পাচ্ছি না

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষক
হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, উত্তর ২৪পরগণা



খুঁজে পাচ্ছি না উপুড় সকালে রোদের আলাপ
ডিঙি বাওয়া গান ভুলে নেমে গেছে কোন্ পারঘাটে
এখন দুপুর — আমের আচার, সাপলুডো খেলা

খুঁজে পাচ্ছি না ভাগ করে খাওয়া ডাল-ভাত-নুন
এক বাড়িতেই জেঠিমা, পিসিমা— সব ভাইবোন
উঠোনে ঠাকুমা বড়ি পাহারায় শীতের বেলা

মেলা থেকে কেনা চুড়ির শব্দ — দাওয়া থেকে ঘর
রেডিও-নাটক কখনো দূরের সাদা-কালো টকি—
কমলা ঝরিয়া, ইন্দুবালা তো কলের গানে

যেন সবকিছু রঙ উঠে যাওয়া ফ্রেমের ছবি
চতুর্দিকেই পায়ে পায়ে শুধু অসংখ্য বাঁক
নিখুঁত ভণিতা শুধু টিকে থাকা অবস্থানে

খুঁজে পাচ্ছি না ঘন বর্ষায় নৌকা ভাসান
রাঙাদা তুমুল ভূতের গল্পে — গা ছমছম
আকাশের গান টাপুর টুপুর টিনের চালে

ফেলে আসা ছবি — পুরনো সে পট গোধূলি আলোয়
পরশীর ঘরে এখনো খুঁজলে..........হারানো আলাপ
যদি থেকে যায় বুকের কোঠায় উর্ণজালে

আজ ঘনদিন অবিশ্বাসের অচেনা প্রহর
কফি, সিগারেট, স্কচ-হুইস্কি — দুরন্ত রেশ
হট সিডি আর নোরা জোন্‌সেই থর থর বুক

লোন, পেনশন আরো আরো ডিএ মেকি সংগ্রাম
মুঠো কোন্ মুখে কত প্রোগ্রাম— কত অভিনয়ে
শুকনো দিনের ডালপালাগুলি পুড়তে থাকুক।

প্রতিবেদন

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলন (নব পর্যায়) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৬-১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম সংলগ্ন সি আই টি হলে।

সম্মেলনের শেষদিন শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বাংলার লেখক-কবি-শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা বারবার সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকট মুহূর্তে সমবেত হয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছেন অতীতেও। ইতিহাসের দাবী মেনেই একদিন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক শিল্পী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। আবার ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সংঘও অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান লেখক শিল্পী সংঘও জন্ম নিয়েছিল পশ্চিমবাংলার আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের আঘাতে গণতন্ত্রহীনতার ১৯৭২-এর কলঙ্কিত যুগে। সে যুগ শেষ হয়েছে। কিন্তু এবার সংগঠনটি অবলুপ্ত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিকরা সংগঠনটিকে কেবল টিকিয়ে রাখেননি, তাকে প্রার্থিত ব্যাপ্তি ও গভীরতাও দান করেছেন।

একটি সংগঠনের ব্যাপ্তি গভীরতা বিচার করার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সংগঠনের সদস্যবৃদ্ধি, সাংগঠনিক কর্মসূচি, কী ধরনের কাদের জন্য শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্ভাবনায় প্রভাব কতখানি পড়ছে, এ সম্পর্কে সদস্যদের সৃষ্টি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কতটা সমৃদ্ধ করছে ইত্যাদি বহু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তিনদিনের সম্মেলনে উত্থাপিত হয়েছে প্রার্থিত পরিণত আঙ্গিকে। হাবিব তনবিরের উদ্বোধনী ভাষণ থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সমাপ্তি ভাষণ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন উত্থাপন থেকে অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের জবাবী ভাষণ, আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনের শুভেচ্ছা ও সংহতি জ্ঞাপনসহ ৫৮জন প্রতিনিধির আলোচনা সর্বত্রই গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের স্বরূপ-স্বভাব তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত ঋজু আঙ্গিকে। ৪৬৪জন প্রতিনিধিসহ পাঁচ শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি কিংবা কৃষ্টিকর্মী ফিরে গেছেন আরও সংগঠিত হবার সমৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা ও প্রেরণা নিয়ে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও এসেছিলেন সমসাথী সহযোদ্ধা।

সংগঠনের ২০টি জেলা কমিটির মোট সদস্যসংখ্যা ১৫৩৮৬। এর মধ্যে ৫৬টি সংগঠন এবং ৩৪৯২জন লোকশিল্পী সদস্য। লোকশিল্পীদের সমপর্যায়ভুক্ত করে এই পদ্ধতিতে সদস্য করার রীতি অতীতে ছিল না। গোবিন্দন কুট্টি কিংবা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাদু নাচের শিল্পী অথবা গম্ভীরার অভিনেতাকে একই সংগঠনের ছত্রছায়ায় আনার অন্তরালে সাধারণীকরণের স্থূলত্ববোধ নিয়ে শিল্পবাদীরা কটাক্ষ করতে পারেন কিন্তু একজন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীর কাছে বিষয়টা দায়বদ্ধতার। এ দায়বদ্ধতা কোনো নিজের কাছে নয় ; শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের পারস্পরিক দায়বদ্ধতায় প্রতিভার তারতম্য আছে। শিল্পেরও বৈচিত্র্য আছে আবার সামাজিক প্রয়োজনের প্রশ্নে ঐক্যবোধেরও অস্তিত্ব আছে।

ষষ্ঠ সম্মেলন উপলক্ষে প্রতিনিধিদের তিনখানি পুস্তিকা দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিতে আছে জেলাওয়ারি সদস্যসংখ্যার চিত্র, আয়-ব্যয়ের হিসাব, স্মরণ, সম্মেলনের নির্ঘন্ট ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি (সংঘের পক্ষ থেকে অবশ্য পুস্তিকায় কোনো সংখ্যা দেওয়া হয়নি) 'সেদিন থেকে এদিন' নামে সংগঠনের ইতিহাস। ১৯৭২ সনের ২৪শে জানুয়ারী ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবেশ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কারা, কেন, কী ধরনের সংগ্রাম সংগঠন করেছেন তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তৃতীয়টি তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক তথা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিবেদন। এরও দুটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে 'পৃথিবীর গভীর অসুখ এখন', 'বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছে', 'সমাজবাদই বিকল্প', 'দেশে দেশে আক্রান্ত গণতন্ত্র', 'সবুজ মনে বেনিয়া আগ্রাসন', 'তবুও আলো তবুও সংগ্রাম', 'স্বদেশে আমার যন্ত্রণার দুঃস্বপ্ন'। 'মাধ্যম, গণমাধ্যম', 'গণসংগ্রাম ও ভারত', 'আমাদের রাজ্য ঃ সঙ্কট এখানেও', 'বিপন্ন মানবতা, আক্রান্ত মূল্যবোধ ঃ আমাদের সাংস্কৃতিক দায়', 'সময়ের কণ্ঠস্বর ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি' — এই ১২টি অধ্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এক বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় কিংবা বিপরীত প্রক্রিয়াকে দেখা হয়েছে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এই অংশের ভাষা, বিশ্লেষণ, অভিমুখ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আস্থাশীল

যে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। প্রয়োজনবোধে নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পুস্তিকার দ্বিতীয় ভাগে আছে সংগঠন ভাবনা।

ষষ্ঠ সম্মেলনের আর একটি বিষয় সচেতন দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিষয়টির নাম সমন্বয় — আবেগের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয়। মঞ্চের পিছনে, হলের করিডোরে পতাকা উত্তোলনের বেদীর পশ্চাৎপট রচনার সমস্ত শিল্পকর্মে ছিল সমন্বয়ের সৃষ্টিশীলতা। কেবল বহিরঙ্গে নয়। শুভেন্দু মাইতির সুরে গীত বৃন্দসঙ্গীত। কেবলমাত্র গানের মাধ্যমে সাধন গুপ্ত কিংবা অমর পালের শুভেচ্ছাজ্ঞাপনে সর্বত্র ছিল এই সমন্বয়ের সংগ্রাম।

আর একটি কথা। মিল ও টিফিনের জন্য হিসেব করে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে অনেকগুলি কুপন দেওয়া হয়েছিল। খাবার দেবার সময় কেউ কুপন সংগ্রহ করেননি, দেনওনি। অথচ এত মানুষের জন্য ব্যবস্থাপনায় সামান্যতম বিশৃঙ্খলা ঘটেনি। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের শৃঙ্খলা, শক্তি ও আত্মবিশ্বাস যত সমৃদ্ধ হচ্ছে একাংশের বিশেষ করে বৃহৎ মিডিয়ার উপেক্ষাও তত উৎকট হয়ে উঠছে।

প্রতিবেদক ঃ রামরমণ ভট্টাচার্য

কিশোর বাহিনীর নবম রাজ্য শিবির

কবি সুকান্তের ভাবধারায় উজ্জীবিত কিশোর বাহিনীর নবম রাজ্য শিবির ডিসেম্বরের ২৫ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উদয়নারায়ণপুরের খিলা গোপীমোহন শিক্ষাসদনে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, দেশপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর আহ্বানকে পাথেয় করে, 'আমরা নোতুন পৃথিবীর ছবি আঁকি'র স্বপ্নকে বুকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ঝাড়খণ্ড, বিহার, আসাম, ত্রিপুরার ৪০১জন ভাইবোনের উষ্ণতায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল ডিসেম্বরের শেষ হপ্তার শীত। ২৫ তারিখ বিকেলে পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে শিবির শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য মুখ্য পরিচালক মনোরঞ্জন বসু। শিবিরের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন শিবপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা অপেক্ষা প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তুলে তিনি বলেন কীভাবে এখানকার আর্থিক স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল অথচ উন্নত মেধা সম্পন্নদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বন্ধুত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সেই পারস্পরিক সহমর্মিতা আজ অনেকখানি অন্তর্হিত। আমাদের মধ্যে যেন সেই মানসিকতা অটুট থাকে। জেগে ওঠে। অন্যান্যদের মধ্যে সভায় বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে মাননীয় সাংসদ হান্নান মোল্লা, প্রাক্তন বিধায়ক পান্নালাল মাজি প্রমুখ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায়। বিধায়ক পদ্মনিধি ধর, কনিকা গাঙ্গুলী, ননীগোপাল চৌধুরী। শিবিরের ভাইবোনেরা ৪দিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। তার মধ্যে দৈহিক সুস্থতার বিষয়গুলি যেমন ছিল, তেমনই মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার প্রশিক্ষণও ছিল। শিবিরের শেষদিনে একটি আলোচনাসভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্ণপরিচয়ের দেড়শো বছরকে সামনে রেখে নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন কিশোর বাহিনীর অন্যতম উপদেষ্টা ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিমান বসু। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, সাংসদ সোনার মেয়ে জ্যোতির্ময়ী শিকদার। সমস্ত দিক দিয়ে এই শিবির একটি সর্বভারতীয় চেহারা নেয় — বলেন শিবির শুরু ও শেষদিনের অন্যতম সঞ্চালিকা, রাজ্য কিশোর বাহিনীর অন্যতম সংগঠক দীপিকা ঠাকুর চক্রবর্তী। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে পরিবেশিত হয় পি পি টি'র পুতুল নাটক 'খুদে পটুয়ার রূপকথা'। এস এ মিদ্দার ম্যাজিক। অর্পণ চট্টোপাধ্যায় ও অলক খাস্তগীরের গান। এছাড়া কিশোর বাহিনীর বিভিন্ন শাখার নাচ, গান, আবৃত্তি। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, আবৃত্তিকার নুপুর বসু। শেষদিন সন্ধ্যায় রাজ্য শিবিরের প্রতিনিধি ভাইবোনেদের সম্মিলিত ১ ঘন্টার অনুষ্ঠান সকলকে মুগ্ধ করে। ক্যাম্প ফায়ার ও আতসবাজি প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে চারদিনের শিবিরের শেষ ঘন্টা বাজে।

প্রতিবেদক ঃ অশোক অধিকারী

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে উচ্চমাধ্যমিকে পরিবর্তিত পাঠ্যসূচি ও প্রশ্নকাঠামোর ভিত্তিতে প্রশ্ন প্রণয়ন সম্পর্কিত কর্মশালা

২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে পাঠ্যসূচির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি। বর্তমান বছরে যে সব ছাত্র-ছাত্রী একাদশ শ্রেণিতে পাঠগ্রহণ করছে, তাদের কাছে তো বটেই, এমনকি যাঁরা পাঠদান করছেন, অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেও প্রশ্নপত্রের কাঠামো বা প্রশ্নপত্র রচনার বিষয়টি এখনও সুস্পষ্ট নয়। প্রায় দু'মাস আগে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত 'সংসদ পরিচিতি'-তে এ সম্পর্কে যে নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তারও বেশ কিছু ক্ষেত্রে আবার পরিবর্তন ঘটেছে। এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী স্বার্থে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে আপাতত সর্বশেষ পরিবর্তনটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সংসদ-নির্দেশিত প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হতে পারেন, এই লক্ষ্যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৩ এবং ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০৫, বারাসাতে সমিতির জেলা কার্যালয় সত্যপ্রিয় সদনের অনিলা দেবী কক্ষে দু'দিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং হিসাবশাস্ত্র — এই আটটি বিষয়ের উপর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবহিত করার দায়িত্বে ছিলেন সংসদের বিষয়-বিশেষজ্ঞগণ।

দু'দিনের এই কর্মশালার উদ্বোধন করতে গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি গোপা দত্ত বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করা হয়েছে। একই সাথে পরিবর্তিত হয়েছে প্রশ্নের কাঠামো এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা। এই কাজে সহায়তা দানের জন্য তিনি তাঁর সংসদের পক্ষ থেকে শিক্ষক সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, শিক্ষকদের পেশায় রয়েছে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা, এবং সেই দায়বদ্ধতা নিয়েই এ বি টি এ-র সদস্য-সদস্যারা যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, সত্যিই তার কোনো তুলনা হয় না। তিনি বলেন, সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করছে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা কত গভীর এবং আন্তরিক।

কর্মশালার প্রধান অতিথি তথা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আগ্রাসনের হাত থেকে সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পথে নতুন পাঠক্রমকেও চালিত করতে হবে, এবং সেজন্যই প্রশ্নপত্র রচনার কাজটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমাদের সমিতির প্রতি শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা অধিকমাত্রায় আস্থা রাখেন। পরিবর্তিত পাঠক্রম ও প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী প্রশ্নপত্র রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের দিশা দেখাতে সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন সেই আস্থারই পরিচায়ক। শিক্ষাকে নিয়ে সমিতির ভাবনা যে কত আন্তরিক হতে পারে, তার বড়ো দৃষ্টান্ত এই জেলা শাখা থেকে প্রকাশিত 'শিক্ষাভাবনা' পত্রিকা — শিক্ষক ও শিক্ষার্থীমুখী ভাবনার জন্য যার চাহিদা আজ অন্যান্য জেলাগুলিতেও লক্ষিত হচ্ছে।

শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম বরিষ্ঠ নেতা শ্রদ্ধেয় গৌরীশঙ্কর বসু বলেন, সবরকম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। তাঁর মতে, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বিষয়ের গবেষণাধর্মী আলোচনার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদের এই কর্মশালার আয়োজন। স্থানাভাবে প্রথম পর্যায়ে ৮টি বিষয়ে হলেও স্বল্পকাল মধ্যে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়েও কর্মশালা সংগঠিত করা হবে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, জেলা শাখা পরিচালিত 'সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষামূলক গবেষণা কেন্দ্রে' বর্তমানে ১২টি বিষয়ে ১০১জন শিক্ষক-শিক্ষিকা গবেষণামূলক কাজকর্ম করে চলেছেন। মূলত এঁদেরই চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শে সমৃদ্ধ 'শিক্ষাভাবনা' পত্রিকাটির গুণগত উৎকর্ষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে সমিতির জেলা সভাপতি স্বপনকুমার সরকার কর্মশালায় আগত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেন, নতুন পাঠক্রমের মুখোমুখি প্রায় দিশেহারা শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমাদের এই কর্মশালার উদ্যোগ-আয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দু'দিনের এই কর্মশালায় ১০জন বিষয়-বিশেষজ্ঞ এবং ৫৬জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় প্রতিটি বিষয়ের আলোচনার সার নির্যাস রিপোর্ট আকারে লিখিত হয়, এবং একটি করে ১০০ নম্বরের নমুনা প্রশ্নপত্র রচিত হয়। সমাপ্তিপর্বে উক্ত ৮টি বিষয়ের রিপোর্ট পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করে শোনানো হয়। প্রায় প্রত্যেকটি রিপোর্টে বলা হয়, এ ধরনের কর্মশালা সংসদের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী করা খুবই প্রয়োজন।

কর্মশালার সমাপ্তিপর্বে উপস্থিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-সদস্যা তথা সমিতির সহ-সভাপতি মাননীয়া রীতা সেন কর্মশালার সাফল্যে অভিভূত হয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থপ্রদানে বিলম্ব বা অনীহার কারণে সংসদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কর্মশালার আয়োজনে সমস্যা আছে ঠিকই, তবুও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিষয়টি সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

দু'দিনের এই কর্মশালার দায়িত্বে ছিলেন সমিতির জেলা শাখার 'শিক্ষা' বিষয়ক উপসমিতির আহ্বায়ক তথা জেলার সহ-সভাপতি ডঃ নিবেদিতা নাগ। মূলত তাঁরই কর্মতৎপরতায় এবং সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে এত বড় কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সফল হয়।

প্রতিবেদক ঃ অসিতকুমার ভৌমিক

গ্রন্থাবলোকন

চুরুলিয়ার দুখু মিঞা

অশোককুমার ঠাকুর

ছোটদের কচিপাতা। ৩৪, বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৯

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রাজার দেওয়া লৌহ-নিগড়ে তার অন্তরের বিদ্রোহী বীর কোন দেবতার আশিস নির্মাল্য দেখতে পেল, তাই সাদরে বরণ করে নিল তাকে আপনার গলে'। অন্তরের বিদ্রোহী সত্তা যখন নিজের বেদনার্ত দিনযাপনকে সঙ্গ না দিয়ে শুধু তাকে স্পর্শ করে আগামীর ভাবনায় ব্যাপৃত থাকে তখনই জন্ম নেয় নজরুলেরা। 'আর সেই অবসরে বরমাল্য হয় নিজের অভাবপীড়িত সংগ্রামী জীবন। নজরুল তাই সেই কবি যিনি দারিদ্র্যকে 'মহান' শব্দে আখ্যা দিয়ে তার গুণকীর্তনে ক্লান্ত হননি। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। 'দুখু মিঞা' শব্দে যত ক্লান্তি আছে, তারও বেশি আছে জীবনজয়ের নেশা। সেই নেশাই কবিকে তাঁর অপ্রকাশ সত্যসন্ধানে ব্রতী করায়। অশোককুমার ঠাকুরের লেখা 'চুরুলিয়ার দুখু মিঞা' পড়তে পড়তে নজরুলের অনৈশ্বর্য, পরিতাপহীন জীবনের সেই অম্লমধুর আপাত বেয়াড়া বেসুরো অনাস্বাদ যেন চলকে ওঠে। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী করে বহুমাত্রিক বই-এর অভাব আজ বাংলায় নেই সত্য তবুও অপ্রিয় মিথ্যা (!) হলো তার কতগুলি ঐ শ্রেণির উপযোগী। অনেক সময়ই প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের 'বুড়ি ছুঁয়ে' শিশু-কিশোরদের যে সন্দেশ উপহার দেওয়া হচ্ছে তা গুরুমস্তিষ্কে যে অনুরণন তুলছে তাতে আর বিজ্ঞান-বিজ্ঞান থাকছে না। হয়ে উঠছে তথ্য সরবরাহ আর কল্পনার মহাভারত। অশোককুমার ঠাকুর সেদিক দিয়ে আমাদের স্বস্তি দিয়েছেন। ছোট ছোট লাইনে, হাল্কা দমের শব্দ ব্যবহারে নজরুলের চুরুলিয়া থেকে ঢাকা অব্দি বিপুল বিহ্বল ছন্নছাড়া জীবনকে ৩২ পাতার মধ্যে ধরিয়ে দিয়েছেন। 'ছড়াকারের নিবেদন' অংশে তিনি যখন লেখেন 'শিশুকালে বাপ-হারা এক/অনাথ পিতৃহীন/ পথে পথে বেড়ায় ঘুরে/ বাজায় অগ্নিবীণ'। তখন সেই শাশ্বত সামাজিক ব্যাধির দিকেই তিনি আমাদের দৃষ্টি নিয়ে যান। যার সার্থকতা শিশুশ্রমে এসে পৌঁছায়। তাই বোধহয় 'দশ বছরের বালকশিশু/মোল্লাগিরি করে/মায়ের মুখে বোনের মুখে/অন্ন যোগায় ঘরে' (দুখুর শৈশব)। 'দুখুর কৈশোর' ছড়াকারের হাতে বেশ খুলেছে। ছন্দ, চিত্রকল্প, দুখুর ছোট বয়সের বহুমাত্রিক উদ্যম অনায়াসে বেরিয়ে এসেছে তাঁর কলমে। পরে তাঁর যুদ্ধে যাওয়া। প্রত্যাবর্তন। 'ধূমকেতু' প্রকাশের মুখে বিশ্বকবির 'আশীর্বাণী' কবি নজরুলের কবিসত্তার মধ্য উন্মেষকে কীভাবে সারস্বত ভাবনায় আলোকিত করেছে তার ইতিউতি ঘটনাগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন তিনি। পরে জেলপর্ব, অনশন, জাতের নামে বজ্জাতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রমীলা দেবীকে বিবাহ, কল্লোলের কাল সব-সবকিছুকেই তিনি এনেছেন তাঁর লেখায়। ছবিতে গল্পের প্রশ্রয় বা প্রয়াস যাই বলা হোক না কেন তাঁর চেষ্টা সার্থক। তবু কিছু লাইন অন্যভাবে লিখলে ছন্দের দায়বদ্ধতা আরো দৃঢ় হতো। যেমন তিনি যখন লেখেন — 'পঙ্গু স্ত্রী প্রমীলা/কষ্টে শুয়ে শুয়ে/ রান্না করেন কান্না করেন/কাত হয়ে নুয়ে'। এই শেষ দু'লাইনেই আপত্তি। ছন্দ এসেছে। ভাবনা আসেনি। অর্থগত দিক দিয়েও অনভ্যাসের প্রতিফলন। একেবারে প্রথম নিবেদন অংশে তিনি লিখলেন — 'দেশের জন্য সব দিয়েও/মান পেলো না দেশে/ পঙ্গু জীবন রইল পড়ে/ দেখলো না কেউ এসে'। একটি আপত্তি। কেউ দেখতে আসেনি তা নয়। অনেকেই এসেছেন। কবির পরিচর্যায় হাত মিলিয়েছেন। কিন্তু যাদের আসার কথা তারা আসেনি। তাই বোধহয়, বোধহয় কেন সেটাই সত্য, 'বাংলাদেশের কর্ণধার/মুজিবর এসে/ নজরুলকে নিয়ে গেল/ স্বাধীন বাংলাদেশে (শেষ কথা)। শেষ অংশে ছড়াকার একটি বিজ্ঞানকে প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন, 'থাকে যদি বাংলাভাষা/ ফোটে যদি ফুল/বঙ্গভাষীর হৃদয়জুড়ে/থাকবে নজরুল'। খুব সত্যি। 'আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয়নিকো নজরুল' (অন্নদাশঙ্কর)। ছড়াগুলিতে অন্তমিলের প্রাধান্যই সর্বত্র দৃশ্যমান। ছন্দ নিয়ে অন্য পরীক্ষা ছড়াকার করেননি। হয়তবা ছোটদের কানে বাজার দিকটিই তাঁর কলমে এসেছে অন্তমিলের প্রশ্রয়ে। ছবিগুলি সু-অঙ্কিত। সর্বোপরি কালানুক্রমিক ঘটনার সঙ্গে কবির জীবনের সমর্পণ ছবিতে সহজভাবে এসেছে। কিছু জায়গায় ছন্দের ওপর খবরদারি না করে নজরদারি করলে আরও সার্থক হয়ে উঠত তাঁর রচনা। বই-এর ছাপা ভালো। মুদ্রণপ্রমাদ প্রায় নেই। বই-এর মলাট যেমন শক্ত তেমন মুখ অংশে নজরুলের বহুল ব্যবহৃত ছবির টান না দিয়ে অন্য কোনো দুখু মিঞার আঁচড় থাকলে ভালো লাগত। বইটি ছোটদের অবশ্যই কিনে পড়া উচিত।

—অশোক অধিকারী

কলসুর হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপরে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের জোটবদ্ধ আক্রমণ

প্রতিবাদ সভা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি শিক্ষাক্ষেত্রের সুস্থ পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে নিরবছিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে। আট দশকের বেশি অতিক্রান্ত বন্ধুর পথে গণতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ ছাত্র ও অভিভাবক সমাজকে সাথে নিয়ে সমিতি অনেক আক্রমণের মোকাবিলা করেছে সাহসের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবিরোধী শক্তি আজ কোণঠাসা হলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থনে সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে তৎপর। সমিতি সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে ধ্বংসের লক্ষ্যেই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপরে শিক্ষাবিরোধী শক্তি বারে বারে আক্রমণ করে। সমিতি পূর্ণশক্তি নিয়েই কলসুর হাইস্কুলের আক্রান্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পাশে আছে, তাদের উপরে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে। এই বক্তব্য রেখেছেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ গত ৭ই জানুয়ারি, ২০০৬-এ উত্তর ২৪পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার কলসুর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায়।

উল্লেখ্য যে গত ৩·১২·০৫ তারিখে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস একজোট হয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করে এক লিখিত আবেদন জমা দেয়। একই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীরা নিজেদের কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন পদাধিকারী বলে উল্লেখ করেন। ৬·১২·০৫ তারিখে নির্ধারিত সময়ে ঐ ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে আলোচনার নাম করে উত্তেজক ও অশালীন মন্তব্য করতে থাকে। উপস্থিত শিক্ষকরা এর মৌখিক প্রতিবাদ করলে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। এই ঘটনায় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঐদিনই দেগঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। গত ২৪·১২·০৫ তারিখে সমিতির দেগঙ্গা আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে থানায় ডেপুটেশন দিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবী জানানো হয়। অঞ্চলের প্রতিটি বিদ্যালয় শাখায় নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে গত ৭ই জানুয়ারি দেগঙ্গা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় কলসুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে।

এই সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সহকারী সাধারণ সম্পাদক উৎপল রায়, সমিতির উত্তর ২৪পরগণা জেলা শাখার সভাপতি স্বপন সরকার, জেলা শাখার সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, সমিতির ওয়ার্কিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য সুজিত দাস, বারাসাত মহকুমা শাখার সম্পাদক অশোক রায়চৌধুরী, দেগঙ্গা আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানবেন্দ্রনাথ মন্ডল। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি রাখালচন্দ্র দাস। বক্তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই দুষ্কর্মের নিন্দা করেন এবং অঞ্চলে সমিতির সদস্য-সদস্যাদের আরো নিবিড় সাংগঠনিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ দুষ্কৃতীদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সংযত থাকতে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুশীলনের চেষ্টা করতে বলেন। নেতৃবৃন্দ বলেন যে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনেই পেশ করতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত করার ঘৃণ্যচেষ্টাকে সমিতির নেতৃবৃন্দ সর্বশক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিহত করার কথা ঘোষণা করেন।

— নিজস্ব প্রতিনিধি

সমিতি সংবাদ

হাওড়া

শ্রদ্ধেয়া নেত্রী মায়া চক্রবর্তীর স্মরণসভা

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে" — এই স্মৃতিমেদুরতাকে সঙ্গী করে ২৬ নভেম্বরের হালকা শীতের অলস মায়া 'যেতে নাহি দিব' বলে হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলের লোকভর্তি হলঘরে যখন ভেসে বেড়াচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল মায়া চক্রবর্তী শুধু একটি নাম নয়, প্রত্যয়ের অঙ্গীকার। তাঁর ছবিতে মাল্যদান করেন উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী, পদ্মা রায়, সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জেলা শাখার সভাপতি দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক শিশির দীর্ঘাঙ্গী, হৃষিকেশ নাগ, অশ্বিনী ঘোড়ুই, গায়ত্রী ভট্টাচার্য, স্বাগতা দাস, সেবা চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পরে অঞ্চলগুলির পক্ষ থেকেও মালা দেওয়া হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন জেলা সম্পাদক শিশির দীর্ঘাঙ্গী। এক মিনিট নীরবতা পালনের পর প্রথমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সমিতির অভিভাবক ও মায়া চক্রবর্তীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের শরিক উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী। তার কথায়, প্রধান নেতৃবৃন্দ একে একে চলে যাচ্ছেন। বিরাট শূন্যতা। আগামী নেতৃবৃন্দ সেই শূন্যতা ভরাট করবেন। মায়াদিকে সংগঠনে আনেন বীণা মজুমদার। ১৯৫১'র ৩রা জুলাই শ্রীদুর্গা বালিকা বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষিকা হয়ে আসেন। লিভ ভেকেন্সিতে কিছুদিন হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে। ১৯৬১ সালে শ্রীদুর্গা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা। অবসরের দিন পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকেই সক্রিয়ভাবে জেলা সংগঠনে যুক্ত হন। শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রতি যে অবহেলা, আশা ছিল দেশ স্বাধীন হবার পর তা কেটে যাবে, কিন্তু কাটেনি। সমিতিতে দাবি ওঠে সক্রিয় আন্দোলনের। আসেন সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী। হাওড়া জেলাতেও আসেন বীণাদি, মায়াদির মতো নেতৃত্ব। তখন বিজয় বক্সী, অমল হালদারের মতো নেতাদের কুক্ষিগত জেলা সংগঠন। সংগঠনকে নিষ্ক্রিয় করার হীন চক্রান্ত চলে জেলায়। এর বিরুদ্ধে নতুন নেতৃত্ব আনার দায়িত্ব নেন আশা রায়, বীণা মজুমদার প্রমুখ। '৬০-এর দশকের শেষদিকে মায়া চক্রবর্তী হন জেলার সম্পাদক। বীণা মজুমদার সভাপতি। ৭০-৭১-এর কালো দিন। শহর ও গ্রামে ৬ জন শিক্ষক শিক্ষা বাঁচানোর আন্দোলনে নিহত হলেন। ১৯৭৩-এর এপ্রিলের ২৮, ২৯ ও ৩০ সমিতির সম্মেলন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ায়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষা আন্দোলনকে পরিচালিত করার প্রস্তাব গৃহীত হলো সভায়। এসেছিলেন জননেতা জ্যোতি বসু। ১৯৮২ সালে রাজ্যের সহ-সাধারণ সম্পাদিকা হন। ছিলেন সংগঠনের দায়িত্বে। ১৯৯২ থেকে '৯৫ রাজ্যের সহ-সভাপতি ছিলেন। আবেগপ্রবণ মায়াদির ছিল আকর্ষণীয় নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। লিখতে পারতেন। লিখতেন কম। ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার ও প্রসারের আলোয় এনেছিলেন তিনি। হাওড়া জেলার সংগঠনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এনেছিলেন তিনি। আজকের সংগ্রাম একটু ভিন্নতর, কিন্তু কঠিন। বিশ্বায়নের নামে সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা আজ আক্রমণের মুখে। সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার শপথ যদি আমরা এই সভায় নিতে পারি তবেই সার্থক হবে এই শ্রদ্ধার আসর।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে মায়াদির স্নেহছায়া, হাফ প্যান্ট পরে তার ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার কথা উল্লেখ করেন। কণ্ঠভেজা আবেগে বলেন, একটার পর একটা স্তম্ভ চলে যাচ্ছেন, তাদের শববাহী শকট আসছে। আমাকে মালা দিতে হচ্ছে। এ এক কঠিন কাজ। মায়াদির স্নেহনিবিড় ছায়ায় আমি মানুষ হয়েছি। দেখেছি নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে কখনো আপোষ করতেন না। স্পষ্টবাদী, নীতিবাদী। তিনি বলতেন, "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" করে সংগঠন নয়। আদর্শে অবিচল থেকে লড়াই-আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংগ্রামের সূচিমুখ ঠিক করতে হবে। ১৯৫৪ সালের বজ্রধ্বনি 'শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী' — তা আমরা অনুধাবন করি মর্মে মর্মে। শিক্ষার দাবী কী, সেই ভাবনা আমাদের দরকার। শিক্ষা বাঁচলে তবেই শিক্ষকের অস্তিত্ব, তবেই সংগঠন। শিক্ষালয়কে ভালবাসা, যে কথা মায়াদি বলতেন, সেই ভালবাসা আজ আমাদের কোথায়! প্রবীণদের দায়িত্ব আজ অনেক বেশি। নোতুনদের অগ্রাধিকার

দিয়ে শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলনে তাদের শামিল করা। ত্যাগস্বীকারের মানসিকতা মায়াদির ছিল। সমস্ত অধিকার বঞ্চিতদের যদি-না আমরা শিক্ষার আলোয় আনতে পারি তবে অবহেলিত হবে শিক্ষার জাতীয় দাবী। এই অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব এই প্রত্যয় নিয়ে ফিরে যাচ্ছি মায়াদির স্মরণসভা থেকে। মায়া চক্রবর্তী অমর রহে।

সভার সভাপতি দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বরাবর হাওড়া জেলার একটি সংগ্রামী ভূমিকা আছে। মায়াদির নেতৃত্বে পেশাগত দাবীদাওয়ার সঙ্গে শিক্ষা রক্ষার আন্দোলন বারবার মূর্ত হয়েছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তি দাবীআদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। মনে রাখা দরকার, Die in harness আইনের সূত্রপাত মায়াদির হাতেই। তাঁর কথায়, আমাদের শক্তি নেতৃত্ব নয়, সমর্থকদের মধ্যে। সংগঠন সম্পর্কে এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাঁর। দায়িত্ব পালনের আনন্দে মুখর থাকতেন তিনি। সেই শিক্ষাই আজকের স্মরণসভার শিক্ষা।

সভায় কবিতা পাঠ করেন সেবা চক্রবর্তী এবং বক্তব্য রাখেন পদ্মা রায়। সমস্ত সভাটি সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার সহ-সভাপতি মোহনচন্দ্র সাঁতরা।

উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ বাণীবন যদুরবেড়িয়া বিদ্যাপীঠে উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার উদ্বোধকরূপে উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও কোষাধ্যক্ষ মাননীয় উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাননীয় মোহনচন্দ্র সাঁতরা, সহ-সম্পাদিকা প্রতিমা চক্রবর্তী। ৭০ জন সদস্য/সদস্যার উপস্থিতিতে সমিতির বালার্ক-লাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সাধারণ সভার সূচনা হয়।

সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী সহ অন্যান্য প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক মহঃ ফারুক। এরপর মাননীয় উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বলেন, ১৯২১ সালের জন্মলগ্ন থেকে দীর্ঘ ৮৪ বছর ধরে শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে লাগাতার লড়াই-আন্দোলন করে আজ সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক ঐতিহ্যশালী সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পেশাগত সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও সমিতি শুধুমাত্র পেশাগত দাবীদাওয়াতেই এর কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাজ্য-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে এর লড়াই-আন্দোলনের অভিমুখ সূচিত হয়েছে।

বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের প্রভাবে সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থা যে আক্রান্ত, তা তিনি উল্লেখ করে উপস্থিত সদস্যগণকে পেশা ও সমিতির প্রতি আরও দায়বদ্ধ ও আন্তরিক হওয়ার আবেদন রেখে তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটান। এরপর আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। প্রতিবেদনকে সমর্থন করে মোট ১০ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। সমিতির ইউনিট ও আঞ্চলিক শাখার সাংগঠনিক কাজের সালতামামি ছাড়াও সর্বশিক্ষা অভিযান, জুনিয়র থেকে হাই বা হাই থেকে হায়ার সেকেন্ডারীতে উন্নীতকরণ, আচরণবিধি, সিলেবাস, ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকার অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে এস এস সি থেকে আগত কয়েকজন তরুণ শিক্ষক-শিক্ষিকার আবেগদীপ্ত ও সমাজ সচেতনধর্মী বক্তব্য উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। এরপর বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাখার সভাপতি সেখ শাহ আলম। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিকূল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির শিকার। উন্নত ভোগবাদী ব্যবস্থা, পণ্যমানসিকতা আর বিশ্বায়নের দাপটে গণতান্ত্রিক জীবনবোধ আজ বিপন্ন। শিক্ষকের ভূমিকা নস্যাৎ করে দূরশিক্ষা বা মুক্তশিক্ষার জয়গান গাওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে শ্রেণিশিখনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই ব্যবস্থার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। পরিশেষে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হাওড়া আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে হাওড়া আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় জেলা প্রতিনিধি হিসাবে জেলার সহ-সভাপতি মোহনচন্দ্র সাঁতরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ঐ বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী শুভ্রা চক্রবর্তী অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি শ্রীমতী ইন্দ্রাণী লাহিড়ী পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ শহীদবেদীতে মাল্যদান করার পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। শোকপ্রস্তাব পাঠ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর মোহন সাঁতরা উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন। প্রাঞ্জলভাবে তিনি শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমিতির

দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন পাঠ্যসূচি সম্পর্কে সমিতির মতামত এবং বর্তমান ইউ পি এ সরকারের কার্যনীতির ফলে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ক্ষতির দিকগুলি সমিতির সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করা হয়। শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে সেই প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যে বিষয়গুলি আলোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছিল, সেগুলি নিয়ে শ্রীসাঁতরা পুনরায় আলোচনা করেন। শ্রীমতী শুভ্রা চক্রবর্তী শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দ পরিবেশিত সম্মিলিত সঙ্গীত অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিকাল ৫টায় সভা শেষ হয়।

বালি আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২০শে আগস্ট, ২০০৫ বালি আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা বালি শান্তিরাম বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল সম্পাদক দেবীরঞ্জন দেবনাথ বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ জয়ন্ত ঘোষাল আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। জেলা শাখার সভাপতি দিলীপ চ্যাটার্জি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক, পেশাগত সমস্যা, প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় কী ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা ও সমিতি সদস্যদের আশু কর্তব্য ব্যাখ্যা করেন। আঞ্চলিক শাখার ২১টি বিদ্যালয় থেকে ১১৭ জন সদস্যবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১৪ জন সদস্য আলোচনা করেন। হাওড়া সদর মহকুমা শাখার সভাপতি রতন কোলে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব-সহ বর্তমান পরিস্থিতি ও শিক্ষকসমাজের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর সারা ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ১২ই জুলাই কমিটি ও আঞ্চলিক শাখার যৌথ উদ্যোগে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সভা শেষ হয়।

বালি আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৭ই ডিসেম্বর বেলুড় হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বালি আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আঞ্চলিক সম্পাদক দেবীরঞ্জন দেবনাথ। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মাহীন্দর। আঞ্চলিক ক্রীড়া উপ-সমিতির আহ্বায়ক দিলীপ মজুমদারের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে শতাধিক



সদস্য-সদস্যা ক্রীড়াঙ্গনে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের শপথ বাক্য পাঠ করান বালি গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা চঞ্চলা মন্ডল। বিভিন্ন বিভাগে ৮০ জন প্রতিযোগী খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাফল্য তাদের বয়স ও অভ্যাসকে যেন ছাপিয়ে গিয়েছিল। সাংগঠনিক স্তরে নতুন-পুরাতনের মেলবন্ধন, অবসরপ্রাপ্তদের উপস্থিতি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

জগাছা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জগাছা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৫ই ডিসেম্বর সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনের মাঠে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশিকা অনুসারে সমস্ত বিভাগগুলিই সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিক শাখার নবীন-প্রবীণদের যৌথ উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সবার মিলিত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতায় প্রতিযোগিতাস্থলে একটি মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সমিতির সদস্যরা ছাড়াও অন্যান্য অনেক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন উৎসাহিত করার জন্য। প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। অঞ্চল সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সম্পাদক ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক চপলকান্তি দাস, দিবজিৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আগামী বছরে আরও বৃহত্তর আকারে আঞ্চলিক শাখার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেবার শপথ গ্রহণ করা হয়।

উলুবেড়িয়া স্টুডেন্টস হেলথ হোমের উদ্বোধন

১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ স্টুডেন্টস হেলথ হোমের উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উলুবেড়িয়া পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত ফুলেশ্বরের ১১ ফটক সন্নিকটস্থ স্বাস্থ্য প্রশাসনিক ভবনের দুটি কক্ষে এই আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ

মাননীয় হান্নান মোল্লা। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় প্রত্যুষ মুখার্জী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মোহনচন্দ্র মণ্ডল, স্টুডেন্টস হেলথ হোমের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ কৌশিক রক্ষিত, মহকুমা শাসক অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ডাঃ অরুণ যাসু, ডাঃ রূপেন বসু মল্লিক, ডাঃ আর বি পাল, মাননীয়া উপাসনা নন্দী, ডঃ আব্দুল সাজেদ মোল্লা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান মাননীয় বটকৃষ্ণ দাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক গৌতম পুরকাইত ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক মহম্মদ ফারুক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখাভুক্ত ৩০টি বিদ্যালয়ের প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, যাদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের, তারা স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা এই আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে পেতে পারে বলে অতিথিবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেন। শুধুমাত্র চিকিৎসা পরিষেবা নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই আঞ্চলিক কেন্দ্র যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করবে এই অভিমত পোষণ করেন। অতিথিবৃন্দ স্টুডেন্টস হেলথ হোম, উলুবেড়িয়া প্রস্তুতি কমিটির সদস্যগণকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

কোচবিহার

কোচবিহার মাথাভাঙা মহকুমা শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৫ সমিতির মাথাভাঙা মহকুমা শাখার উদ্যোগে এ কে পারাডুবি হাইস্কুল মাঠে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চতুর্থ বার্ষিক মহকুমা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা শাখার সভাপতি নুরুদ্দিন মিঞা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এ কে পারাডুবি হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ ও নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। তিনটি জোনের মোট ৮৩ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিজয় মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলা, মহকুমা ও আঞ্চলিক শাখার নেতৃবৃন্দ। পয়েন্টের ভিত্তিতে মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় মাথাভাঙা পূর্ব আঞ্চলিক শাখা। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মহকুমা শাখার সম্পাদক রণজিৎ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন ক্রীড়া উপসমিতির সম্পাদক তপনকুমার দাস।

মাথাভাঙা মহকুমা শাখার উদ্যোগে বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী সভা

মাথাভাঙা মহকুমা শাখার উদ্যোগে গত ৪ঠা ডিসেম্বর '০৫ মাথাভাঙা উচ্চবিদ্যালয়ে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে মহকুমা শাখার বিগত ১ বছরের পালিত কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন মহকুমা সম্পাদক রণজিৎ রায়। নূরউদ্দিন মিঞা, সমরেশ বর্মন ও ফরিদউদ্দিনকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন।

বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী সভার মূল বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দিনেশ ডাকুয়া। তিনি উত্তরবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির উত্থান এবং বিস্তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে হিতসাধনী সভা কোচবিহারের মানুষকে ভাগ করতে পেরেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে খাস জমির দুর্বার আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন কোচবিহারের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং শ্রেণিচেতনা বৃদ্ধি করেছে। ঐ হিতসাধনীর বীজ থেকেই বিভিন্ন সময়ে অঙ্কুরিত হয়েছে উত্তরখণ্ড, উতজাস, কামতাপুরী ও গ্রেটার কোচবিহার ইত্যাদি বিভেদকামী শক্তি। শ্রেণিসংগ্রামকে দুর্বল করে এবং বামফ্রন্টকে দুর্বল করতেই এইসব অশুভ শক্তির উদ্ভব হয়েছে। জোতদার ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী পরিবার থেকে আসা হতাশাগ্রস্ত কিছু ব্যক্তি কোচবিহার রাজ্যের ভারতভূক্তির চুক্তিকে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাবাবেগ তৈরীর চেষ্টা করছে ও করে চলেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচন বানচাল করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। এই সমস্ত অশুভ শক্তির মুখোশ খুলে নেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষক সমাজকেও গ্রহণ করতে হবে। তিনি তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করে এদেরকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানান। এছাড়াও ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির পক্ষে অনুপম দত্ত।

বর্ধমান

এক বছরের পালিত কর্মসূচি নিয়ে বর্ধিত জেলা কাউন্সিলের সভা

গত ২০শে নভেম্বর বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে বিগত 'এক বছরের পালিত কর্মসূচি' নিয়ে একটি বর্ধিত জেলা কাউন্সিলের সভা বর্ধমানের আমোদবিহারী বসু ভবনে (এ বি টি এ হল) অনুষ্ঠিত হয়। সকল জেলা কাউন্সিল সদস্য, ৫টি মহকুমা কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং জেলার অন্তর্গত ২৭টি জোনাল সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে ঐ সভা হয়। বেলা ১১ টায় সমিতির পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন জেলা কাউন্সিল তথা রাজ্য সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এরপর যথারীতি শহীদ বেদীতে মাল্যদান এবং শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, আব্দুল মান্নান এবং বিনয় মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যদিয়ে সভার মূল কাজ শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সমিতির সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, এ বি টি এ একটি পেশাগত সংগঠন। তাই একটা মূল কাজ হলো পেশাগত সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা ও প্রয়োজনে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা। সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু আমরা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার জন্য শিক্ষক সমাজকে উৎসাহিত করতে হবে। বিশেষ করে এখন যে সর্বশিক্ষা অভিযান চলছে, সেখানে সঠিক ভূমিকা পালনে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, তা কাটিয়ে উঠতে হবে। তিনি ঐতিহাসিক '৫৪-এর আন্দোলন যে কীভাবে গণআন্দোলনে রূপ পেয়েছিল তা পর্যালোচনা করেন।

এরপর জেলা সম্পাদক মহম্মদ ইউনুস সভায় খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন এবং জেলা কোষাধ্যক্ষ নুরুল হক বিগত এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

শিক্ষক আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ রামকৃষ্ণ ব্যানার্জী নবীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমিতির অতীত ইতিহাস জানা এবং সঠিকভাবে বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করার আহ্বান জানান। তিনি সর্বশিক্ষা অভিযানকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের আরও আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন। মূল্যায়ন ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য আরও আলোচনা চালানোর উপর গুরুত্ব দেন। প্রতিবেদনের উপর ৫টি মহকুমা থেকে মোট ১১জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জেলা সম্পাদক জবাবী ভাষণে বিভিন্ন সংযোজনী এবং সংশোধনী সহ জানান যে বর্তমানে সংগঠনের কাজকর্ম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের পরিধিও ক্রমাগত বাড়ছে। আমাদের নিজেদের সক্রিয় সংগঠকদের ব্যবহার করেই ঐ কাজ আমাদের করতে হবে। 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর গ্রাহক তথা পাঠক বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংশোধনী খসড়া প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ সভায় মোট ২০০জন উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুল মান্নান সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বর্ধমান সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে '৫৪-এর আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা সভা

গত ২৭শে নভেম্বর '০৫ বর্ধমানের আফতাব এ্যাভিনিউস্থিত আমোদবিহারী বসু ভবনে (এ বি টি এ হল) বর্ধমান সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে বর্তমান শিক্ষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির '৫৪-এর আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন '৫৪-এর আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্ব দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী এবং মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির নেতা অধিক্রম সান্যাল। দেবেনবাবু তাঁর বক্তব্যে '৫৪-এর আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সঙ্গে সেইসময়ে শিক্ষক আন্দোলন সংগঠিত করার নানান বাস্তব অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। সেইসব প্রতিকূলতার মধ্যেও নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে কিছু শিক্ষক নেতা শিক্ষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। যার ফলে ঐ আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ পায়। সেই সঙ্গে তিনি তৎকালীন শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা ও চাকুরীর নিরাপত্তাহীনতার কথাও উল্লেখ করেন।

অধিক্রমবাবু তাঁর বক্তব্যে ঐ আন্দোলনে নিজেকে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে উল্লেখ করেন। সকলের জন্য শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং ১৯৫০ সালে গঠিত খের কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার দাবীতে ১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে যে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু হয়েছিল এবং রাজভবনের সামনে গণঅবস্থান করা হয়েছিল, তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। কীভাবে ঐ আন্দোলনকে ছাত্র

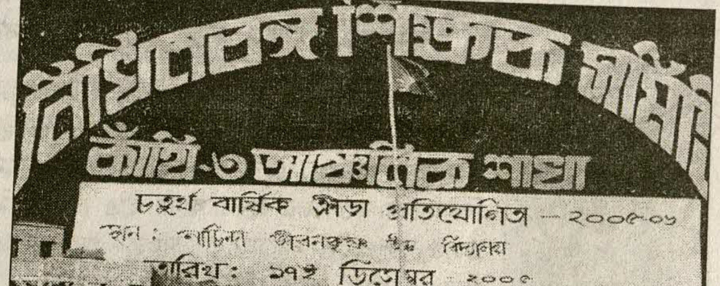
সহ সাধারণ জনগণ নিজেদের আন্দোলন বলে মনে করেছিলেন, তাও তুলে ধরেন। এমনকি বামপন্থী দলসমূহের এই আন্দোলন সমর্থন করার জন্য তৎকালীন বিরোধী নেতা শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসুকেও গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী হয়। তিনি বিধানসভায় অবস্থান করে গ্রেপ্তারী এড়িয়ে আন্দোলনের সমর্থনে বিধানসভায় বক্তব্য রেখে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য করেন — তা উল্লেখ করেন। কয়েক দিন পর বিধানসভার অধিবেশন শেষ হলে পুলিশ জ্যোতি বসুকে গ্রেপ্তার করেন। ১৯৬৬ সালে অবৈতনিক শিক্ষা, সম্মানজনক বেতন, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি আদায়ের দাবীতে আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন কোনো দাবীই মেনে নেননি। উপরন্তু শিক্ষকদের সম্পর্কে অত্যন্ত অশালীন মন্তব্য করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির ঐতিহাসিক আহ্বান ঃ 'এই জনবিরোধী এবং শিক্ষাবিরোধী সরকারকে উৎখাত করো' ('oust this anti-people and anti-education Government') এর উল্লেখ করেন এবং শিক্ষকদের কর্মবিরতির ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের যে ক্ষতি হয় তা পূজাবকাশে পাঠদান করে ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়ার মতো শিক্ষকোচিত আচরণের কথা জানান যা এই প্রজন্মের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন। তিনি রাজ্যে বামফ্রন্ট জমানায় গণমুখী শিক্ষার প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের অভিঘাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের অপচেষ্টার তুলনা করেন এবং সমিতির মূলধ্বনি 'শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী, জাতীয় দাবী মানতে হবে' — এই শ্লোগানের ভিত্তিতে শিক্ষার অঙ্গনে বাণিজ্যিকীকরণের অনুপ্রবেশ রুখতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলকে আন্দোলনে সামিল করার অনুরোধ জানান।

ঐ আলোচনা সভায় সমিতির জেলা সম্পাদক মহম্মদ ইউনুস '৫৪-এর আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রকল্পকে হাতিয়ার করে শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেষ্ট হবার জন্য শিক্ষক সমাজের কাছে আবেদন জানান। সভায় জেলা নেতৃত্ব সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, '৫৪-এর আন্দোলনের আর এক স্বেচ্ছাসেবক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আমানুল্লাহ আকবর, সদর মহকুমা সম্পাদক শিবশংকর চট্টোপাধ্যায় সহ অপর নেতৃত্বরা সকলে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় প্রায় ২০০জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন সদর মহকুমা সভাপতি নুরুল হক।

পূর্ব মেদিনীপুর

কাঁথি-৩ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কাঁথি-৩ আঞ্চলিক শাখার চতুর্থ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৭ই ডিসেম্বর নাচিন্দা জে কে হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি আবুল কালাম খান। বিভিন্ন ইভেন্টে মোট ৬৮জন শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। বিচারক ছিলেন ক্রীড়াশিক্ষক শ্রীকান্ত কর, অরুণ পন্ডিত, তাপস দাস প্রমুখ। শিক্ষকদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা



দেখার জন্য স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ মাঠে হাজির হন। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। এই ধরনের প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সভাপতি আবুল কালাম খান। সম্পাদক প্রভাংশু মণ্ডল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং নাচিন্দা জে কে হাইস্কুল ইউনিটের ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেন সুধাকৃষ্ণ বর্মন ও অসিত বিশাল।

শোক

সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান



বাংলা কথাসাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। গত ১৩ই ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁর ছোটগল্প স্বতন্ত্রমর্যাদা নিয়ে পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসগুলিও ছিল স্বতন্ত্র ধারায়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হল। লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল — 'এখন আমার কোন অসুখ নেই', 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী', 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী', 'হ্যাঁ প্রিয়তমা', 'জঙ্গলের দিনরাত্রি', 'আমি ও বনবিহারী' প্রভৃতি। 'আমি ও বনবিহারী গ্রন্থটির জন্য লেখক সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়া পঞ্চাশটি গল্পসংগ্রহের জন্য তিনি বঙ্কিম পুরস্কারও লাভ করেন।

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সি পি আই রাজ্য পরিষদের সদস্য কমরেড গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান



বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কমরেড গৌতম চট্টোপাধ্যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান আমাদের উৎসাহিত করেছে। ছোট বয়স থেকেই তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৪০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্র বসুর ডাকে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, ১৯৪২-এ লেবর পার্টিতে যোগ দেন। এরপর থেকে তিনি ক্রমশ মার্কসবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং ১৯৪৩-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

স্বাধীনোত্তর দেশেও তিনি নানা আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্বরূপে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যও ছিলেন। এছাড়া তিনি অসংখ্য বই লিখেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে সমিতি হারাল এক সুহৃদকে। সমিতি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা শোক প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত প্রিয়জনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

সশস্ত্র উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রাক্তন পুরুলিয়া জেলার সভাধিপতি রবীন্দ্রনাথ কর ও তাঁর স্ত্রী

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৫ রাত পৌনে দুটো প্রায় ৩০ জন সশস্ত্র উগ্রপন্থী সি পি আই (মাওবাদী) ঘিরে ফেলে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার ভোমরাগোড়া গ্রাম। সেখানে তারা পুরুলিয়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি, প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষক ও গণআন্দোলনের নেতা রবীন্দ্রনাথ কর ও তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ী করকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে হত্যা করে। এই পৈশাচিক হত্যালীলার সাক্ষী থেকেছেন প্রয়াত করের বৃদ্ধা মা, বিবাহিতা মেয়ে,

নাতনি, নাতি আর গোটা গ্রাম। মৃত্যুর ২০দিন আগে হুমকি-চিঠি বয়ে এনেছিল ডাকঘরের পিওন। প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ কর টলেননি। খুনের পরোয়ানাকে অগ্রাহ্য করে তিনি বলেছিলেন, "এই মাটি ছেড়ে নড়ব না। লড়াই হবে এই মাটিতেই"। শুধু বামপন্থী আন্দোলনে, গণআন্দোলনে এবং পুরুলিয়ার উন্নয়নের কাজে যুক্ত থাকার অপরাধে উগ্রপন্থীরা তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করল। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই। শোকাহত চিত্তে সমিতি প্রয়াত কর-দম্পতির বৃদ্ধা মা, পুত্র-কন্যা ও আত্মীয় স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে। মৃত্যুর কারবারীরা এবং তাদের ইন্ধনকারীরা হত্যালীলা চালিয়ে বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গের কোনোপ্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। মতাদর্শগত লড়াইয়ের মাধ্যমে এই সন্ত্রাসকে পরাজিত করবেন পশ্চিমবাংলার জনগণ। শহিদ-দম্পতির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে সমিতি।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ কর ও আনন্দময়ী কর অমর রহে।

সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এম সি পুরি নিহত

গত ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৫ বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স চত্বরে দিল্লি আই আই টি'র প্রাক্তন অধ্যাপক এম সি পুরি নিহত হয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে। অধ্যাপক পুরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর এভাবে প্রকাশ্যে খুন হওয়া দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে এবং দেশবাসীর কাছে এক উদ্বেগজনক ঘটনা। অধ্যাপক পুরীর অন্যতম অবদান ছিল কম্পিউটারের সফ্‌টওয়্যার ডিকোডিং এবং কোডিং সিস্টেমে বাইনারি লজিকের প্রয়োগ। এটা দেশের তথ্যপ্রযুক্তির তথ্য সরবরাহের পরিষেবাকে দারুণভাবেই সমৃদ্ধ করেছে। প্রয়াত বিজ্ঞানী এম সি পুরি মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম পরিকল্পিত একটি প্রতিরক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কৃতবিদ্য এই অধ্যাপক অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য। 'সিলিকন ভ্যালিতে' এ হেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর হত্যাকান্ড মর্মান্তিক এবং সমগ্র জাতির বিশাল ক্ষতি। সমিতি এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করছে, নিহত বিজ্ঞানীর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে, একই সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে নিরাপত্তার বিষয়টিতে নজর দিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করুন এই দাবি জানাচ্ছে।

দিল্লিতে মাটি ধসে মৃত মালদহের ১০ শ্রমিক

দক্ষিণ দিল্লির জাসোলা গ্রামে বহুতল শপিং মলের নির্মাণের সময় মাটির ধসে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন ১৩ জন শ্রমিক। এঁদের ১০ জনই পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা থেকে কাজ করতে গিয়েছিলেন। ৫০ ফুট নিচে মাটি কাটার সময় আচমকা একদিকের মাটির দেওয়াল ধসে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অভিযোগ উঠেছে কোনো নিয়মকানুন ছাড়াই চলছে নির্মাণকার্য। তার বলি হচ্ছেন দরিদ্র শ্রমিকরা। সমিতি নিহত শ্রমিকদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে মৃতদের আত্মীয় স্বজনদের। নির্মাণের নামে শ্রমিক শোষণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে চলতে পারে না। তাই সমিতি শ্রমিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছে সরকারের কাছে।

ওড়িশায় পুলিসের গুলিতে নিহত ১৫ জন আদিবাসী

গত ৩রা জানুয়ারি, ২০০৬ ওড়িশার জাজপুর জেলায় কলিঙ্গনগরে পুনর্বাসন ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভরত আদিবাসীদের ওপর গুলি চালিয়ে পুলিস ১৩ জন আদিবাসীকে হত্যা করেছে। অভিযোগ, ওড়িশা সরকারের তথাকথিত শিল্পায়নের নীতিতে ঢালাও লুঠ হচ্ছে জমি, অরণ্যভূমি এবং খনিজ সম্পদ। বাধা দিলেই চলছে পুলিসী আক্রমণ। আগে ঘটেছিল কাশীপুর, কালাহান্ডিতে এবারে ঘটল কলিঙ্গনগরে। জাজপুর জেলায় ৫০

হাজার একরেরও বেশি এলাকা নিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে বিশাল কলিঙ্গনগর শিল্পনগরী। যুগ যুগ ধরে এই জমিতে বসবাস করছেন দরিদ্র আদিবাসীরা। অতি কষ্টে এই রুক্ষ জমিতে ফসল ফলিয়ে তাঁরা কোনোরকমে টিঁকে আছেন। ওড়িশা শিল্পোন্নয়ন নিগম এই জমি জলের দরে দিয়ে দিচ্ছে দেশী-বিদেশী বড় বড় শিল্পমালিকদের। কলিঙ্গনগরে আদিবাসীদের জোর করে জমি কাড়তে গিয়ে কোনো ক্ষতিপূরণের কথা বলেনি ওড়িশা প্রশাসন। উপরন্তু পালাতে থাকা আদিবাসীদের ওপরেও গুলি চালিয়েছে পুলিস। প্রাণরক্ষার জন্য পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া আদিবাসীদের হত্যার উদ্দেশ্যে পুকুরের জলেও গুলি চালিয়েছে পুলিস। সমিতি এই অমানবিক নৃশংস পুলিসী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে, ধিক্কার জানাচ্ছে এবং নিহতদের আত্মীয় স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে সমিতি।

নিন্দা, ধিক্কার

নতুন বছরের সূচনাতেই বিহারে নৃশংস গণহত্যার ঘটনা ঘটল। গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৫ বিহারের শ্যামচাঁদ গ্রামে দুষ্কৃতীদের লাগিয়ে দেওয়া আগুনে তালা বন্ধ বাড়িতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ৫ শিশুসন্তান সহ মারা গেলেন মা। গৃহকর্তা মারাত্মক দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে। সমিতি এই ঘটনায় বেদনাহত, শোকস্তব্ধ। এমন হৃদয়বিদারক ঘটনার নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই। নিহতদের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সমিতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছে।

নিন্দা, ধিক্কার

গত ২৪শে ডিসেম্বর শনিবার পাটনায় 'Para Teacher'-দের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে সমিতি তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ এই মিছিলে পুলিশের বর্বরোচিত লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে সমিতি গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষকে প্রতিবাদে সামিল হবার আহ্বান জানাচ্ছে।

●



● বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের বামিরা গুরুদাস ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক সত্যনারায়ণ দে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৪ বৎসর।

● পুরুলিয়া জেলার চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী শশধর সেন গত ৩রা ডিসেম্বর প্রয়াত হন।

● পুরুলিয়া জেলার কস্তুরবা হিন্দি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী রাজকুমার দাস গত ২৭শে নভেম্বর প্রয়াত হন।

● পুরুলিয়া জেলার জয়পুর আর বি বি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সীতারাম মাহাত গত ২৫শে ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

● পুরুলিয়া জেলার জয়পুর আর বি বি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী সুকদেব লাহা গত ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ঐ বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন শিক্ষক নাসিরুদ্দিন আনসারী গত ৯ই জানুয়ারী প্রয়াত হন।

● বাঁকুড়া জেলার নাড়িচা সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠের সহ-শিক্ষক ভূজঙ্গভূষণ বারিক গত ৭ই জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বৎসর।

এঁদের মৃত্যুতে সমিতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে।

পাঠকের কলমে

মাননীয় সম্পাদক
'শিক্ষা ও সাহিত্য'

'শিক্ষা ও সাহিত্য' নভেম্বর, ২০০৫ সংখ্যাটি হাতে এসেছে। পড়লাম। ক্রমাগত এ পত্রিকাটি পড়ার পর নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারছি নানাদিক থেকে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি' প্রকৃতপক্ষে কী এবং কাদের হয়ে কাজ করছে — এবিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হচ্ছে। এ সংখ্যায় বিবেকানন্দ চক্রবর্তীর অনুরূপ একটি প্রবন্ধ 'এ বি টি এ কেন ?' মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। লেখাটি সংক্ষিপ্তাকারে হলেও বেশ ভালো। আরো একটু হাত খুলে লিখলে ভালো হতো। কারণ এ বি টি এ সম্পর্কে, তার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অনেক শিক্ষক কিছুই জানেন না। বিশেষ করে আমার মতো যারা SSC পরীক্ষার মাধ্যমে আসা নতুন প্রজন্মের শিক্ষককুল। এ বি টি এ-র দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে আজ আমরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি তা এদেশের শিক্ষক ইতিহাসে বিরল। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে কোনো শিক্ষককে দেখলে লোকে বলত — "হ্যাঁ রে, এখনও মাস্টারী করছিস ? চাকরী-বাকরী কিছু পেলি না ?" গোটা শিক্ষকজাতির কাছে এ প্রশ্ন ছিল চপেটাঘাতের মতো। এ লজ্জা তো আমাদের পূর্ব প্রজন্মরা বহন করেছেন। এ ইতিহাস আমরা ভুলি কী করে ? পূর্বের অবজ্ঞা, অবহেলা, উন্নাসিকতা থেকে আজকে আমরা কোথায় এসেছি ? একবার আত্মজিজ্ঞাসা জরুরী নতুন নতুন শিক্ষকদের। আমাদের কোনোমতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলনের কথা। রক্তঝরা সে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে আমাদের। ইতিহাস ভুললে চলবে না।

এ বি টি এ-র আন্দোলনের সব সুযোগ-সুবিধা নেব আর তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবো না, এ হতে পারে না। প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমিও একমত হয়ে বলতে চাই, নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা যাতে সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং সমিতির ইতিহাস জানতে পারেন সেদিকে সমিতিকে নজর দিতে হবে। তৈরি থাকতে হবে বিভিন্ন সভা-কর্মশালা অনুষ্ঠিত করতে। সচেতন থাকতে হবে এর সাংস্কৃতিক রাজনীতির জন্যও। দুঃখের বিষয়, অনেক এ বি টি এ-র সদস্যরা ভাবছেন আন্দোলন করা এবং সংগঠিত করার দিন বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। এ ধারণা অমূলক। শিক্ষকদের পূর্ণ মর্যাদা বৃদ্ধির লড়াই আরো করে যেতে হবে। 'শিক্ষা ও সাহিত্য' জার্নালটি নিয়মিত পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে এ বি টি এ-র প্রতিটি জোনাল কমিটিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করি, এ বি টি এ-র আন্দোলন সিনিয়র শিক্ষকদের পাশাপাশি নতুন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে (কেবল সদস্য না বানিয়ে রেখে) সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে। সাংগঠনিক দায়িত্ব না পেলে তারা কাজ সহজে অনুভব করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে ভাববেন। এ প্রস্তাব আমার মত আরো সদস্যবন্ধুদের। দূরে যারা আছেন তাদেরও সমর্থন পাবে আমার এ প্রস্তাব আশাকরি। এ বি টি এ কেবল শুধু এ বি টি এ নয়, সমগ্র শিক্ষকজাতির 'দুধেভাতে' থাকার বিশল্যকরণী।

নম্র শ্রদ্ধাসহ
জীবনকুমার সরকার
শিক্ষক, বিরামপুর এ এস বিদ্যামন্দির, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০০৫

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বায়নী ভোগবাদ-সর্বস্ব অপসংস্কৃতির বিপরীতে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই সারা রাজ্যব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করে চলেছে। গত ১৩ই নভেম্বর, ২০০৫ তারিখে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সেন্ট পলস্ স্কুলে। বিগত বছরগুলির মতোই এবারেও এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। প্রায় চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ছয় শতাধিক অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ঐদিন সেন্ট পল্‌স স্কুলে উপস্থিত ছিলেন। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ও সমাজের অন্যান্য অংশের ৫০জন বিশিষ্ট গুণিজন বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রীতা সেন, জনার্দন দাসাধিকারী, নির্মলেন্দু গুহ, উৎপল রায়, বিকাশ মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানটিকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য প্রতি বছরের মতই এবারও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কলকাতা জেলা শাখার আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঃ রাজ্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঃ

স্থান	প্রতিযোগীর নাম	বিদ্যালয়ের নাম	জেলা
		বসে আঁকো — ক	
প্রথম	সুমন কোলে	উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ	হুগলী
দ্বিতীয়	চিত্রদীপ গোস্বামী	বেলিয়াতোড় উচ্চবিদ্যালয়	বাঁকুড়া
তৃতীয়	কেয়া দত্ত	ব্যারাকপুর গার্লস হাইস্কুল	উত্তর ২৪ পরগণা



বসে আঁকো — খ

প্রথম	শর্মিষ্ঠা বারিক	উত্তরপাড়া রাজমোহন পাল বালিকা বিদ্যাপীঠ	হুগলী
দ্বিতীয়	রাহুল ভুইঞা	হ্যামিল্টন হাইস্কুল	পূর্ব মেদিনীপুর
তৃতীয়	অভিদিত্য রায়	ধূপগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়	জলপাইগুড়ি

গল্প বলা

প্রথম	মোনালিসা পাত্র	আমতা বালিকা বিদ্যালয়	হাওড়া
দ্বিতীয়	গার্গী সেন	শ্যামসুখী বালিকা শিক্ষানিকেতন	মালদহ
তৃতীয়	রিয়া দেবনাথ	অঞ্জনগড় হাইস্কুল	নদীয়া

নির্বাচিত গদ্যাংশ থেকে পাঠ

প্রথম	পার্থ সাউ	ধাড়শা মিহিরলাল খাঁ ইনস্টিটিউশন	হাওড়া
দ্বিতীয়	দীপেশ চৌধুরী	ভাটপাড়া অমরকৃষ্ণ পাঠশালা	উত্তর ২৪ পরগণা
তৃতীয়	ক্রান্তি দাস	গঙ্গাপুরী শিক্ষাসদন	কলকাতা



হুগলী জেলার রেবা ব্যানার্জী কর্তৃক আবৃত্তি-ক বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে কৌশিক স্মৃতি পুরস্কার প্রদত্ত হলো

আবৃত্তি — ক

প্রথম	সোহিনী বোস	দমদম বৈদ্যনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস	উত্তর ২৪ পরগণা
দ্বিতীয়	তনুশ্রী রায়	মাথাভাঙা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	কোচবিহার
তৃতীয়	সৃষ্টি বিশ্বাস	সিউড়ি আর টি গার্লস স্কুল	বীরভূম

আবৃত্তি — খ

প্রথম	চন্দ্রশেখর ভট্ট	গোপালপুর হাইস্কুল	পূর্ব মেদিনীপুর
দ্বিতীয়	শ্রেয়সী ভট্টাচার্য	রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়	দক্ষিণ ২৪ পরগণা
তৃতীয়	পায়েল সেনগুপ্ত	যাদবপুর বিদ্যাপীঠ	কলকাতা

আবৃত্তি — গ

প্রথম	দেবশ্রী মুখোপাধ্যায়	হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ	উত্তর ২৪ পরগণা
দ্বিতীয়	নূপুর কুণ্ডু	শান্তিপুর বাণী শিক্ষামন্দির	নদীয়া
তৃতীয়	বসন্ত সরদার	ভট্টনগর কুলকামিনী বিদ্যামন্দির	হাওড়া

আবৃত্তি — ঘ

প্রথম	নন্দিনী ভড়	বরানগর রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল	উত্তর ২৪ পরগণা
দ্বিতীয়	সুস্মিতা বসাক	রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল	উত্তর দিনাজপুর
তৃতীয়	সৃজিতা বর্মণ	সুরেন্দ্রনাথ গার্লস হাইস্কুল	হাওড়া



হিন্দি আবৃত্তি — ক

প্রথম	কৌস্তভ অধিকারী	সেন্ট জেমস হাইস্কুল	জলপাইগুড়ি
দ্বিতীয়	হীরক দে	নাকতলা হাইস্কুল	কলকাতা
তৃতীয়	ঋতুপর্ণা সাহা	নবদ্বীপ তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়	নদীয়া

হিন্দি আবৃত্তি — খ

প্রথম	তানিয়া চৌধুরী	রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়	দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দ্বিতীয়	প্রিয়া সাউ		পুরুলিয়া
তৃতীয়	শান্তনু নাথ	গৌরীপুর হিন্দি বিদ্যালয়	উত্তর ২৪ পরগণা

উর্দু আবৃত্তি — ক

প্রথম	হেনা নাজ	খড়দহ মক্তব হাইস্কুল	উত্তর ২৪ পরগণা
দ্বিতীয়	সাদিয়া পারভীন	আঞ্জুমান ইসলামিয়া গার্লস হাইস্কুল	কলকাতা
তৃতীয়	সৈয়দা হিজাব বেগম	লালবাগ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হাইস্কুল	মুর্শিদাবাদ

উর্দু আবৃত্তি — খ

প্রথম	শাব্বির আলি আজাদ	ইসলামিয়া হাইস্কুল	কলকাতা
দ্বিতীয়	নেহা শাহিন		পুরুলিয়া
তৃতীয়	হুসনা আরা	খড়দহ মক্তব হাইস্কুল	উত্তর ২৪ পরগণা

সঙ্গীত — ক

প্রথম	শ্রীপর্ণা কর্মকার	ইছাপুর গার্লস হাইস্কুল	উত্তর ২৪ পরগণা
দ্বিতীয়	সূর্যতপা ধর	শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	হুগলী
তৃতীয়	পায়েল দাস	ধুবুলিয়া সুভাষচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়	নদীয়া

সঙ্গীত — খ

প্রথম	সুমনা সামন্ত	রাজকুমার সান্ত্বনাময়ী গার্লস হাইস্কুল	পূর্ব মেদিনীপুর
দ্বিতীয়	দেবমাল্য মুখার্জী	কোতরং ভূপেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়	হুগলী
তৃতীয়	মৌমিতা ভট্টাচার্য	রামপুরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	বীরভূম

সঙ্গীত — গ

প্রথম	প্রিয়াঙ্কা গুহ	মাটিগড়া হরসুন্দর হাইস্কুল	দার্জিলিং
দ্বিতীয়	মধুরিমা ভট্টাচার্য	কে টি পি পি হাইস্কুল	পূর্ব মেদিনীপুর
তৃতীয়	মৌদীপা নন্দী	ডায়মণ্ডহারবার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সঙ্গীত — ঘ

প্রথম	পরিচিতা চক্রবর্তী	মহিষাদল রাজ হাইস্কুল	পূর্ব মেদিনীপুর
দ্বিতীয়	শীর্ষেন্দু নারায়ণ দেব	নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ	হুগলী
তৃতীয়	মিতালী ঘোষ	টালিগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল	কলকাতা

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা — ক

প্রথম	পারিজাত ব্যানার্জী	সুলতানপুর হাইস্কুল	বর্ধমান
দ্বিতীয়	নভেন্দু এন জানা	কে টি পি পি হাইস্কুল	পূর্ব মেদিনীপুর
তৃতীয়	লিসা কোলে	চ্যাঙডোবা হাইস্কুল	বাঁকুড়া

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা — খ

প্রথম	রাজর্ষি মজুমদার	মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল	পশ্চিম মেদিনীপুর
দ্বিতীয়	সাইদুল হক	নগর আজিজা মেমোরিয়াল হাইস্কুল	মুর্শিদাবাদ
তৃতীয়	অর্ণবকৃষ্ণ চৌধুরী	ভদ্রকালি উচ্চ বিদ্যালয়	হুগলী

প্রবন্ধ — ছাত্র-ছাত্রী

প্রথম	অমৃত চট্টোপাধ্যায়		পুরুলিয়া
দ্বিতীয়	অরিন্দম মিশ্র	বেলদা গঙ্গাধর এ্যাকাডেমি	পশ্চিম মেদিনীপুর
তৃতীয়	অরিত্র প্রামাণিক	হরিরামপুর এ এস ডি এম উচ্চ বিদ্যালয়	দক্ষিণ দিনাজপুর

প্রবন্ধ — শিক্ষক-শিক্ষিকা

প্রথম	প্রকাশ মণ্ডল	রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়	মুর্শিদাবাদ
দ্বিতীয়	শ্যামলী শূর	বৈদ্যপাড়া গার্লস হাইস্কুল	কলকাতা
তৃতীয়	আশীষ গড়াই	মেটেলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বীরভূম

প্রবন্ধ — শিক্ষাকর্মী

প্রথম	শচীদুলাল ভট্টাচার্য	স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট	কলকাতা
দ্বিতীয়	অরূপরতন দাস	ইছাপুর বিভূকিঙ্কর উচ্চ বিদ্যালয়	উত্তর ২৪ পরগণা
তৃতীয়	মানিক মোহন ঘটক	কোতুলপুর হাইস্কুল	বাঁকুড়া

সমবেত সঙ্গীত

প্রথম	সিঞ্চন দাস অভীক সরকার শুভম সরকার রূপম সিনহা অভিষেক সেনগুপ্ত অরিজিৎ ঘোষ অভীক ভট্টাচার্য	নাকতলা হাই স্কুল	কলকাতা
দ্বিতীয়	অনুমিতা সেনগুপ্ত সংধৃতা চক্রবর্তী মালিনী চন্দ আরুণিকা বসু পারমিতা দাস	সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়	জলপাইগুড়ি
তৃতীয়	পূর্বালী চ্যাটার্জী শ্রাবণী মণ্ডল চিত্রলেখা রায় অনন্যা রায় সোহিনী লোধ	বর্ধমান বিদ্যার্থীভবন গার্লস হাইস্কুল	বর্ধমান

শিক্ষা ও সাহিত্য

বর্ষসূচি ঃ ১৪১১-১৪১২
মাঘ, ১৪১১-পৌষ, ১৪১২

মাঘ,১৪১১

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল

ফাল্গুন,১৪১১

প্রচ্ছদশিল্পী : রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল

জ্যৈষ্ঠ,১৪১২

সম্পাদকীয়

কবিতাগুচ্ছ

প্রচ্ছদশিল্পী : রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল

আষাঢ়,১৪১২

সম্পাদকীয়

কবিতাগুচ্ছ

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল

শ্রাবণ,১৪১২

প্রচ্ছদচিত্র ঃ ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল হুল স্মরণে
সিউড়ির সিধো-কানহু ভবন প্রাঙ্গণে নির্মিত শহিদ স্তম্ভ

ভাদ্র,১৪১২

আশ্বিন,১৪১২

কার্তিক,১৪১২

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল

অগ্রহায়ণ,১৪১২

ঃ প্রচ্ছদচিত্র ঃ

সমিতির ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সত্যপ্রিয় রায় স্মারক বক্তৃতার বিষয়বস্তু 'বিশ্বায়ন ও সমাজতন্ত্র'-এর ওপর বক্তব্য রাখছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়েক। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস ও সমিতির নেতৃবৃন্দ।

Teachers' Journal INDEX

JANUARY-DECEMBER, 2005

January, 2005

February, 2005

Teachers' Journal

ORGAN OF THE ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Editor : Sri Bikash Mandal ★ Joint Editor : Smt. Aparna Sanyal (Banerjee)

VOL. LXXXV **NO. 1** **JANUARY, 2006**

Editorial

FIGHT THE SINISTER DESIGNS

Religious fundamentalists are essentially bigots – they cultivate and nourish unreasonable but strong beliefs and opinions about religion and social customs and refuse to accept and even listen to the opinions of anyone who disagrees them. Intolerance and religious zealotry they worship. This religious zealotry utlimately assumes the proportion of fascistic outlook which favours strong central authority and doesn't allow any type of freedom. But our society is plural and unity in diversity and diversity in unity is the essence of our political and cultural life. The religious fundamentalists do not believe in pluralism. Here, one thing is to be kept in mind that these forces, actually, mix-up religion with politics. Their eyes are fixed on political mileage. Fundamentalism of the majority and minority forces is always regressive. But majority fundamentalism is aggressive and strives to grab state power, but its minority counterpart is generally defensive in nature and does not inculcate the idea of establishing political hegemony. The BJP is a puppet in the hands of RSS, Biswa Hindu Parishad, Bagranj Dal, Shiv Sena etc. Being aided by these forces the BJP assumed power in the centre and endeavoured to gag the voice of rationalism. These forces advocate blind superstitions practices and obscurantist ideas. Fundamentalists consider democracy subservient to thier authoritarian concept of governance. The progressive people have to take the lead so as to extricate the simple-minded common people from the clutch of the bigots.

The people of the country displayed their political acumen in the last parliamentary elections. The BJP-led NDA was striking at the roots of our mozaic culture, and nakedly working at the best of IMF-World Bank-WTO and big monopoly houses sacrifying national interests. The ouster of the anti-people NDA Govt was the need of the time. The ulterior motive of the Govt became transparent though it often spoke of 'Swadeshi'. The allies of the BJP are all narrow in political perceptions and indulge in ignoble endeavours to further their interests. Each political party represents a class,

and directs its activities to serve best the interests of the class it represents. Protection of the secular character of the state is a vital issue in a multi-religious, multi-cultural and multi-lingual country. The NDA is careless about the interests of the poor people. Twelve poor tribal people were butchered in Orissa's Kalinganagar who demanded compensation, while in Bihar nearly 200 people of the weaker sections were killed by the landlords and money-lenders in last few weeks. The tribal people, people of the backword communities and the poors at large are subjected to repression by the social hierarchy. Communalism reigns supreme in BJP governed states.

The TMC, an ally of the BJP, is forming alliance with secessionist parties even to fight assembly elections in West Bengal. It is expected that minimum scruple should have a place in forming an alliance. Prior to elections TMC supremo strives to build up 'Mahajot'. But fronts grow up through struggles on principled politics. The people of West Bengal know well that the 'Mahajot' perception is seasonal, and politics of opportunism can never be humane in nature – its growth is highly artificial and hence, fragile too.

Objective reality is a factor to reckon with in political affairs. The UPA Govt has been installed in the centre on pragmatic lines. The left forces have accepted to support the UPA Govt on certain conditions. It has been acceded to that Common Minimum Programmes (CMP) should steer the affairs of governance. The main vision of CMP is to protect the interests of the poor people. It is known to the left forces that CMP will not move ahead spontaneously. The Congress too represents the affluent sections, and is a strong believer of globalisation.

The left forces have cautioned the people that constant pressure has to be made for implementation of the CMP. The class character of the Congress will stand as a stumbling obstacle, but constant vigil and movements are to be initiated to compel the UPA Govt to run the affairs of the state within the orbit of CMP. If situation demands the decisions of the govt should be opposed openly. Mass struggles are to be organised against the anti-people policies of the govt. The central govt is just relectant to ameliorate the conditions of the poor people, but enthusiastic in the matters of privatisation and disinvestment. The Congress loves to bow down to US imperialism. The govt displays least initiative in agricultural investments, strengthening of public distribution system, poverty reduction programmes etc. Naturally, the left forces are raising these issues since they are committed to protect the interests of the poors and the people at large.

The ensuing assembly elections will be held under this prevailing conditions. History speaks that, ABTA has always worked to preserve and protect the benefits of the common people who are greatest beneficiaries of the democratically run institutions. The teachers always show the people the correct path.

15th January 2006

Call Of The Association

SIBAPRASAD MUKHERJEE
General Secretary

The last day of the last year adds a new chapter in the illustrious history of the Association. The concluding celebration of the Golden Jubilee of historic 1954 Movement was held on 31 December 05 at Calcutta University Institute Hall. In that auspicious ceremony the most revered people's leader Jyoti Basu, who was sent behind the bars by the then anti-education Congress Govt for supporting the just and legitimate demands of the teachers and educational employees was present. Sri Basu denounced the attitude and activities of the then govt both inside and outside the Assembly House. He paid homage to the martyrs who sacrified their lives for the interests of education. It is pertinent to mention that this historic movement ultimately transformed into people's struggle. Now, education is exposed to the dangers of commercialisation, communalisation and privatisation. As a direct sequel of all these, the common schooling system is suffering immensely and to arrest these onslaughts broad-based people's resistances are to be organised. The Assemblage on that day has given this clarion call. It has been reiterated that people's movements are to be strengthened to silence all evil endeavours.

The meeting has asserted that the teaching community should innovate approaches for better classroom transactions and display more commitments to our endeared learners. We can never afford to forget that the Association decided to take up extra classes during holidays to compensate the loss of teaching days caused by the cessation of works during the days of the struggle. We must keep this spirit up – we must respect our legacy and tradition. The classroom transactions are to be elevated in such a fashion that curricular activities may be completed within the school hours.The students should not feel the necessity of purchasing education.

The L F Govt has taken up laudable initiative to appoint teachers against the vacant posts. This is a timely venture which will widen the scope for better learning-teaching endeavours. This year nearly 22 thousand additional teachers will be appointed in different Secondary and Higher Secondary Institutions and Madrasahs across the state. It is so needed as 2000 Junior Schools and 254 High Schools have been upgraded this year to High and HS school respectively.The task of such huge

appointments is slated to be done through the School Service Commission. Apart from it, the state govt will spend Rs. 75 crore for development of the infrastructure – out of this amount, an amount to the tune of Rs. 10 crore has already been sanctioned and the rest Rs. 65 crore will be sanctioned this year by the finance deptt. The educational institutions are experiencing huge enrolments and hence, development of infrastructure has become an unavoidable necessity. The embargo on appointment of edul. employees has been lifted to a great extent. It is heartening that the educational movements have caused considerable expansion of educational scope. And girls' enrolment has raised to 49% in the state. We must lend support for actualisation of the pro-people educational policies of the L F Govt.

The Secondary Examinations will start on 24 February. Last year, six lakh twenty seven thousand candidates appeared at the exam, but this year nearly two lakh more candidates will appear at the said exams. Initiatives are to be taken so that our endeared students can appear at this important public exam without facing any discomfiture.

The UPA Govt has decided to curtail subsidy on food grains by Rs. 4 thousand 5 hundred 24 crore further which will directly hit crores of poor people. The Central Govt has adopted some other decisions on Public Distribution System which will put the people living under below poverty line into further sufferings. We must join the programmes organised to denounce the anti-people activities of the UPA Govt. This Govt has the tendency of serving the interests of the economic imperialists. Massive protests and movements are to be built up to restrain the present incumbents from pursuing any anti-poor policy.

Cold wave swept all over the country in recent past causing death to a large number of lives. On behalf of the Association I extend commiserations to the relatives of the victims.

10 January 2006

SPEECH OF DR. KALIDAS NAG IN THE PARLIAMENT ON 18.2.54 IN SUPPORT OF THE MOVEMENT IN BENGAL

Mr. Chairman, I start probably from the wrong and I do not accept that the Bengal Teachers' problem is a state subject or a provincial problem. It is a vital subject which affects the destiny of our whole nation. Incidentally it is in Calcutta. But this has a symbolic aspect and it has got a symptomatic character. It is the nature of the tragedy that I want to bring before my hon'ble colleagues here. What is its symptom? The symptom is that we, who are fairly well placed in life, are not sufficiently conscious of the silent, yet serious tragedy that we are allowing by our policy of drift to develop in our social life. Therefore, though geographically the occurrance is a Calcutta incident, it is an all India affair; and from that point of view, I beg to draw the attention of the members of Parliament "especially yours Mr. Chairman, who spent many years of his life to Calcutta."

I take you into confidence – You, Sir, who have spent over 20 years in Calcutta and Bengal, why this progressive deterioration in the relationship between educated leaders and the teaching classes. I feel that something serious is happening in the very foundation of our educational life. We ought to be ashamed, Sir, and as a teacher, I know that before independence we had teachers, who are paid less than Rs. 30 per month. From Rs. 30 you have raised the Basic salary to Rs. 60, but, then, what is the worth of a rupee these days? My hon. friend, Prof. Ranga knows what a rupee meant in our school days and what a rupee means to-day. If you as responsible parliamentarians, delude yourselves with the belief that by slightly raising the percentage here or there, you have solved the problem, you are much mistaken. You are not even touching the fringe of the dangerous problem. The teachers who are silently suffering this hardship are vital members of our body politics. We should feel for silent sufferers rather than for the talkactive people who go about and show that they are asserting their rights. These humble teachers have also their civil rights, nay, their God-given rights. You know Sir, when you started your great career as an educationist with the first University Commission (1917), there were few notes or sketching chapters here and there on the victims of this grade education, for we were too busy then with the so-called "higher education." In those days it was fashionable under the British regime, to classify teachers under higher education and lower education. I am not concerned with higher education though I wasted my life in that branch of the education. I came to be concerned because I was invited by my friends of Orissa to preside over the Primary Teachers' Conference in Puri. I felt ashamed and humiliated in my conscience to find that such low salaries are paid to our rural teachers and they are all family men with wives and children. There are experienced ladies in this House and I request them to give their candid opinion on this vital subject. It is not a question of party or of a province. It is the basic problem of the whole of India and there has been no All-India Commission from the days of Lord Macaulay, for full one century (1830-1930) to examine and have a realistic and intensive analysis of the economic and social condition of the Indian teachers who are to support the whole superstructure of the higher education in India. It is an inverted pyramid (three times have I climbed the pyramids) and I give you this warning that if this precariously balanced pyramid topples over, it will be one of the greatest disasters not only to Bengal or to India, but to the whole world. We are not seriously looking after the basic living requirements of millions of our teachers. They are condemned to live in sub-human conditions and I appeal to all of you hon'ble friends to forget the party and consider whether as a free nation we should not take up this challenge

of life to the common sea where some sections of our own community are obliged perpetually to live under such tragic conditions. This question is not of giving much but only of giving the irreducible minimum on which they are to live. Very little has been discussed on this issue in the two university commission reports, including the Radhakrisnan Commission. Let there be real Basic Education Commissions and no more ommissions! We want a commission actually of the central government to determine an all-India basis standard of living for the teachers and on that basis to regulate the budget. In this last speech I delivered in this session, I request every responsible Members of the House of the People and our Council to think of the teachers of the nation who silently bore this burden all these years and who naturally, with the dawn of Independence, are entitled to ask the question – "What is the meaning of Independence to me if I do not find food and education for my own children and my family?" In illness they have no surplus to pay the doctors.

Let us go to their homes; they are our kith and kin and all of you know how responsible the humble teachers are, but we have refused them even the barest needs of life. We cannot maintain our Independence by keeping millions of teachers in this condition. It is a question of tomorrow and the day after. It is not Five Year Plan. Many of us will be eliminated before our five year plans have materialised. I request every one to think of these teachers. We may, if necessary, adjourn this House and go there in the streets of Calcutta and see the real situation. We are all one country, one India and the humble teachers support the structure of higher education. We should come down to their level and join hands with them and say, they, too, have right to live decently. For this is a fundamental right in our constitution as well as in any progressive constitution of the world. I have gone through the world several times and I am ashamed to find that after seven years of Independence, we have given our teachers such a treatment. India's future is linked up with the amelioration of the teachers' condition. Let justice be done and let truth alone triumph. That is my humble submission.

New York Times

Calcutta riot's again under fire

Calcutta. India, Feb.17 – For the second successive night, police fired into groups of demonstrator here, wounding several.

Yesterday's riots that turned from a demonstration supporting pay demands of striking school teachers, were followed by a morning and afternoon of comperative calm.

In the evening clashes occured in a park in central Calcutta when groups attempted to defy the ban on the assembly of more than five persons. The police were subjected to desultory attacks with home made bombs and rocks from surrounding streets. As darkness gathered, attacks intensified and the police used their guns.

The rest of the city was quiet and troops patrolled yesterday's trouble spots. Strong army detachments guarded buildings damaged yesterday. As especially strong guard was mounted at the United States Information Services premises in Chowringhee, a target of yesterday's riot.

As a result of last night's clashes buses and street cars were not running to-day , but most shops in the main streets and most business premises were open. Yesterday's casualties among rioters were estimated at six dead and seventy injured. Sixteen mounted policemen, a dozen foot policemen, six police horses and nine fireman were also injured.

Troops called into aid the police had a sobering effect in the streets, which contained the charred remains of at least a dozen vehicles.

The promulgation of the decree prohibiting public assembly of more than five persons throughout the city also had a quieting effect. Another calming factor was that yesterday's mass arrest of left wing leaders appearred to have left the mob leaderless.

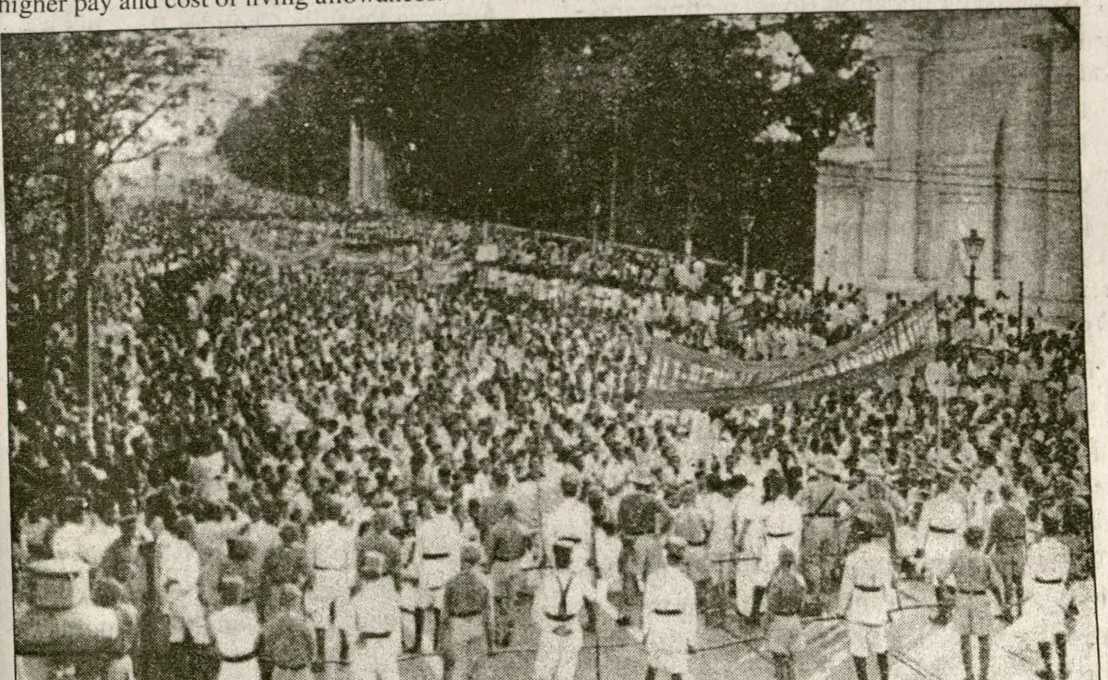
New York Times

Nehru defeats censure motion over Calcutta rioting

News : Special to the New York Times

New Delhi, India, Feb. 18 – The Congress party government under prime minister Jawharlal Nehru defeated to-day the first motion of censure debated by parliament since India became Independent in 1947. The motion was on a technical point relating to a discussion of the riots of last two days in Calcutta. The goverment won by 259 votes to 66. The opposition complained that Mr. Nehru had agreed to allow the Council of States, or upper house, to discuss the question but had ignored the feelings of the House of the people, or lower house which was really the representative body of the people.

New Delhi, India, Feb. 18 (AP) – The Police opened fire for the third consecutive day to-day on unruly crowds in Calcutta a government radio broadcast said here. Six people have been killed, more than sixty injured and at least 160 arrested in left wing demonstrations that flared up in Calcutta on Tuesday. The riots were sparked by a strike of 23,000 West Bengal school teachers agitating for higher pay and cost of living allowances.



"Marathan Squat"

"ঐতিহাসিক অবস্থান"

The Closing Ceremony Of The Celebration The Golden Jubilee Of The Historic Chuyanna Movement

The closing ceremony of the Celebration of the Golden Jubilee year of the historic 'Chuyanna Movement' was held on December 31, 2005 at Calcutta University Institute in the midst of thousands of teachers overcrowding the hall. Sibaprosad Mukhopadhyay, the General Secretary, ABTA initiated the discussion on Chuyanna Movement referring it to as the post-independent united movement of the teaching community India had ever seen. Secondary Education Board recommended Rs. 35 as DA along with basic pay ranging from Rs. 73 to Rs. 180.Dr. B.C. Roy, the then Chief Minister of West Bengal and the leader of the National Congress not only denied it vehemently but also deployed police force to break historic state-wise strike observed by the teachers on February 10 and a massive assembly of teachers at Raj Bhavan Gate. At the dead of night on February 14 teachers were arrested and a violent assault went on upon a long procession of people around 40 thousands on February 16 with lathi and teargas shells. The undemocratic and anti-people government led by Dr. B.C.Roy fired on hungry teachers and peaceful protesters resulting in 6 dead and 157 wounded. The historic movement of 1954 brings out the truth that the united movement of people, be it teachers or workers is the only means of salvation.

Biman Basu, the chairman of the Left Front gave his inaugural speech in which he reminisced chuyanna movement. Looking back to past is essential if we are to prepare our way to building future for our taughts and the people in general. This organisation (ABTA) was formed in the mid twenties not only for the interest of the teaching community but also for the emancipation of the Indian people from the colonial bondage of the British.

Acharya Prafulla Chandra Roy, the first President of ABTA, initiated that freedom struggle against colonial rule through Swadesi industry and self-reliance.

'I am indebted to Samity' Biman Basu said while reminiscing his boyhood days. It was 1949 when I saw a long procession marching through the broadway of our city, Kolkata with a slogun' Aei Azadi Jhuta Hai'. I couldn't understand why such slogun was given at that time. In 1953 came the Movement against the rise in tram-fare and the historic resistence of tramworkers and common people which made me realise how people were dissatisfied with what was going on then in every sphere of life. After that started historic chuyanna's memorable 12-day struggle of Madhyamik teachers. It shook me to the root and made me understand how Congress party and its Ministry was playing an anti-people role in general and anti-teaching community in

particular.

'Demanding subsistance wage is not a crime' told Jyoti Basu in his assembly speech. The Jugantar Patrika ran its frontline, 'when'll the teachers' problem be solved?' Jyoti Basu was raising his protest everyday in the assembly, 'Our teachers are on the road.' He asked Dr. B.C. Roy in a sarcastic voice. 'What's your peon's salary, and how much do you pay as salary for your constable?' Reminiscing the pivotal role Jyoti Basu played for improving the lot of the teaching community he described how people from all sections of the society came forward to extend their help in building solidarity with the movement of the teachers against the government which kept teachers unfed.

The teachers had no service security at that time. There was no pension scheme. Only 18 thousand teachers then came under the Grant-in-aid Scheme. Today more than one and half lac of secondary teachers get full pay protection under the Grant-in-aid scheme. Teachers on an average get Rs. 10,000 as salary and teachers retired from service get not less than Rs. 6000 as pension today.

How was that possible? Was it not for chuyanna's memorable struggle? Biman Bosu threw his question to the audience Jyoti Basu was never a teacher but he served imprisonment for the teachers like you. Everyone came forward and a total change in academic scenario was possible. It was social commitment and commitment to the students which brought people from all strata of life in support of teachers' demand. This should be remembered by all of you. You should take vow to fulfil your commitment in building nation on this auspicious day.

Jyoti Basu took his chair right at 10-55 a.m. amidst shouting of sloguns and cheers. General Secretary Sibaprosad Mukhopadhyay offered him a framed picture of his portrait in which he was delivering a lecture in support of historic Chuyanna Movement.

In his speech he told that he was glad to be among teachers.

'We, the communists depend solely on people', Jyoti Basu remarked 'We've no other interest except peoples' interest', though it was hard to meet peoples' demand.'

It was people who created history by forming Left Front government for six consecutive times. What a cruel and inhuman torture was unleased upon us. Basu went on reminiscing ' we're always with you. We took part in your Dharna. I myself stood by you and spoke in support your demand in the Dharna.' Unorganised people living from hand to mouth took part in your movement.'

'I could remember a little', told Basu 'all of your leadership were arrested and kept in Presidency Jail. My father rang me and said, 'The police had come to arrest you.' On hearing this I took a taxi and went straight to the assembly. The budget sesson was going on then. I told, "Hon'ble Mr. Speaker, I like to stay in the assembly for a few days. The speaker gave me permission. I don't know whether he was aware of the consequences of such permission. But Dr. B.C. Roy's police could not arrest me till I was in the assembly.'

'It should also to be mentioned 'Jyoti Basu

said, 'you compensated the loss of the students for your movement by taking classes during vacation.'

I was glad to spend a little time with you today. We have done most of what we committed to the people. Still we have some negative aspects which we must overcome. We've to go to the people, keep faith upon them and make them realise why we're unable to do everything and what's our limitation.

Jyoti Basu ended his speech saying that all of us must keep faith upon martyr and be ready to go a long way for changing society.

Kanti Biswas, Minister-in-charge for Primary and Secondary education also addressed teachers and narrated how, through odds the education department had to initiate change in the living condition of the teachers. He pointed to the glorious achievement in the sphere of spreading education in the state, referring to this year's increase of about three Lac Madhyamik examinees in addition to six Lac examinees of the previous year. He appealed to the teaching community to bridge the gap between the teachers and the taughts and thus lend their hands in saving common school system.

Bhabesh Moitra, educationist and Ex-Principal of ABTA College gave his valuable speech on the historic movement of 1954.

The whole programme was conducted by Aparesh Bhattacharya, Assistant General Secretary under the presidentship of Baidyanath Mukhopadhyay, the president of organisation.

Reported by Amar Banerjee

SCHOOL TEACHERS FEDERATION OF INDIA

4,Dr. Radhakrishnan Nagar, Abdulla Street, Choolaimedu, Chennai-600094

Dear Comrades,

I am happy to send the first circular, after successful holding of Third All India Conference at Hyderabad on 17th and 18th December, 2005.

The theme of the conference :

- Save and strengthen public education.
- Resist communalisation and commercialization of education.

562 delegates and observers attended the conference. Among the received credential reports of 533 delegates and observers 470 are males and 63 are females.

Conference started with flag hoisting by our president D. Rami Reddy. In the inaugural session welcome address was given by co-chairman of the reception committee Dr. C. Ramiah. Messages were given by Prof. Arjun Dev., former professor NCERT, Com. Madhu, member of parliament, and Com.Thomas Joseph, president AIFUCTO, Com. S.Veeraia, national secretary CITU, R. Arun Kumar, national president SFI, P. Butchi Reddy, general secretary, Navodaya School Teachers' Union. Our chief guest Com. Sitaram Yechuri, member of parliament delivered the special address.

During the delegate session, on the general secretary Com. T. Panchanan's report, the following 27 delegates participated in the discussion : Com. Satyapal Siwach & Com. Nirmal Rathe (HRAS), Com. Bahadur Singh & Com. Joginder Singh Aulack (GTU-Punjab), Com. M.K. Sreedharan & Com. P.D. Sreedevi (KSTA), Com. Vakil Singh & Com. Ram Swaroop Chadurvedy (RSS-Sekawat), Com. S.Thanikasalam (TNHHSSGTA), Com. Abhijit Mukherjee & Com. Bidwan Banerjee (ABPTA), Com R. Jayaraman (TAP), Com. Chinmoyee Dey & Com. Baidyanath Mukherjee (ABTA), Com. A. Balasubramanian (TIAS), Com. Amal Chaterjee (TGTA), Com. T. Adithan & Com. Jansi Rani (TNPTF), Com Ranganath Havaldar & Com. Ramadevi (KRPSSSS), Com. Ramani Barman (AHSSTA), Com. Nandan Chakrabarthy (TTA), Com. S. Chelladurai (TNPGTA), Com. Hari Singh & Com. Gulam Mohammad Sha (USTA-J&K), Com. K. Venkata Rao & Com. Ch. Ravi (APUTF).

The conference passed 15 resolutions on :

1. To intensity struggle against imperialism.
2. Right to strike.
3. Against private and foreign universities.
4. Against FDI in education and GATS.
5. To enact constitutional amendment to control self-financing institution.

6. Against communalization on education in BJP-ruled state.
7. Financing of education.
8. Solidarity with struggling people.
9. Against new pension scheme.
10. National Curriculum Framework - 2005.
11. Abolition of child labour.
12. Abolition of consolidated pay scales
13. Implementation of CMP.
14. Work ethics.
15. Social justice and the Supreme Court judgements.

The conference announced the following future course of actions :

1. Asks the constituent organization to do solidarity actions in support of the protest day observed by leading trade unions to increase EPF interest rate.
2. Our struggle against communalization and commercialization on education will continue. We also continuously fight against anti-teacher and anti-employee pension fund regulatory and development authority bill.
3. We will organize taluk, district and state level seminars and conventions on National Curriculum Framework-2005 and right to education bill.
4. Our fight to compel the UPA government to implement CMP will continue.
5. The new general council should organize a teachers rally in Delhi with our demands in proper time.

New general council with 70 members elected the secretariat members and executive committee. The then general secretary Tushar Panchanan conducted the election in the presence of the then president D. Rami Reddy. Followed by the conference there was a big rally and public meeting in which thousands of teachers of Andhra Pradesh and our delegates and observers participated.

Delhi convention on education :

All the constituent organizations are requested to participate in the Delhi convention on education on 12th and 13th January, 2006. (ABTA-1, ABPTA-1, KSTA-2, APUTF-2, TNPGTA-1, TNPTF-1, TNHHSSTA-1, TIAS-1, TAP-1, RSS(S)-5, GTU (Punjab)-5, HRAS-10, TGTA (H.B. Road)-1. TTA (H.B. Road)-1, USTA (J&K)-1, KRPSSSS-1, CENTRE-3) total-38. Registration fees Rs 100/-. Venew will be informed later.

All the constituent organizations are requested to send addresses of their state office, general council members will full particulars, phone number, fax number and e-mail (if any), for any future correspondence not later than 31st December, 2005.

I request all the constituent organizations to print the full details of the conference in their monthly magazine and send copies to all constituent units.

K.RAJENDRAN
General Secretary, STFI

STFI 3rd All India Conference, 17-18 December, 2005

Secretariat Members

President	Kartik Mandal	ABPTA
General Secretary	K. Rajendran	TNPGTA
Jt. Gen. Secretary	A.K.Chandran	KSTA
Treasurer	Ch. Subhas Chandra Bose	APUTF
Vice Presidents	1. Pradeep Biswas	ABPTA
	2. Sibaprasad Mukhopadhyay	ABTA
	3. N. Narayana	APUTF
	4. S.T. Anthonisamy	TNPTF
	5. Sultan Singh Ola	RSS(S)
	6. John Philip	KSTA
Secretaries	1. Utpal Roy	ABTA
	2. Smt. M. Samyuktha	APUTF
	3. Sucha Singh Ajnala	GTU (Punjab)
	4. Satyapal Siwach	HRAS (Haryana)
	5. Amal Chatterjee	TGTA (H.B.Road)
	6. M.K. Sreedharan	KSTA

ECMembers

ABPTA
1. Gourangalal Das
2. Radha Ballav Saha

ABTA
1. Baidyanath Mukhopadhyay
2. Mitra Bhattacharya

APUTF
1. N. Ramanaiah Sastry

TIAS
1. A. Subramaniyam

TNHHSSGTA
1. A. Mayavan

TAP (Pondichery)
1. R. Jayaraman

J&K USTA
1. Banarasi Dass Sharma

KRPSSS(R)
1. Rama Devi

TTA (H.B.Road)
1. Narayan Rudrapal

General Council Members

ABPTA (11)
1. Kartik Mandal
2. Gourangalal Das
3. Samarendra Sarkar
4. Paresh Adhikari
5. Radha Ballav Saha
6. Abhijit Mukherjee
7. Ehshan Ali
8. Anjali Hazra
9. Pradeep Biswas
10. Nishi Kanta Das
11. Biresh Sikdar

RSS (3)
1. Sultan Singh Ola
2. Bhanwar Purohit
3. Devendra Singh

HRAS (3)
1. Satyapal Siwach
2. Wazir Singh
3. C.N.Bharati

TGTA (H.B.ROAD) (2)
1. Ashok Mitra
2. Amal Chatterjee

ABTA (13)
1. Baidyanath Mukhopadhyay
2. Sibaprasad Mukhopadhyay
3. Bikash Mandal
4. Monoranjan Bhadra
5. Nirmalendu Guha
6. Mitra Bhattacharya
7. Mozammel Haque
8. Utpal Roy
9. Rita Sen
10. Samir Bhattacharya
11. Aparesh Bhattacharya
12. Dilip Sarkar
13. Janardan Das Adhikari

APUTF (11)
1. D. Rami Reddy
2. Ch. Subhas Chandra Bose
3. N.Narayana
4. P.Krishnamurthy
5. N. Ramanaiah Sastry
6. Smt. M. Samyuktha
7. MAK Dutta
8. Sd. Ziauddin
9. I. Venkateswara Rao
10. P. Babu Reddy
11. Smt. K. Vijaya Gouri

GTU (4)
1. Sucha Singh Ajnala
2. Parshotam Lal Bilga
3. Prem Kumar Rakkar
4. Kulwant Singh Gill

TNPTF (4)
1. G. Muralidharan
2. N. Parvatharajan
3. T. Kannan
4. S.T.Anthonisamy

AHSTA(2)
1.
2.

TIAS (1)
1. A. Subramaniyam

TNHHSSGTA (1)
1. A. Mayavan

TNPGTA (1)
1. K. Rajendran

TAP (Pondichery (1)
1. R. Jayaraman

J&K USTA(1)
1. Banarasi Dass Sharma

KRPSSS(R) (1)
1. Rama Devi

TTA(H.B.ROAD)(1)
1. Narayan Rudrapal

KSTA
1. J. Cletus
2. N. Sadanandan
3 .P.D.Sree Devi
4. P.S. Surendra Nath
5. A.K.Chandran
6. John Philip
7. C.Usman
8. K.N.Sukumaran
9. M.K. Sreedharan
10 .M.Shajahan

SCHOOL TEACHERS FEDERATION OF INDIA

4, Dr. Radhakrishnan Nagar, Abdhullah Street, Choolaimedu, Chennai-600094

Circular : 2 16.01.2006

Dear comrades,

I am happy to meet you through this circular. First of all, I convey my New Year Greetings.

All India Convention of Education :

All India Convention of Education was held on 12th and 13th January 2006 at JNU City Center, 35, Farosjha Road, New Delhi. Delegates from STFI, SFI, DYFI, All India peoples science network, College and University Teacher's Associations attended the convention. From our organiaation, 26 delegates participated (TNPGTA-1, TNHHSSGTA-1, TIAS-1, APUTF-4, KSTA-2, HRAS-7, RSS (S)-3, GTU (Punjab)-4, ABPTA-2, USTA (J&K)-1. No representation from ABTA, TNPTF, TAP (Pondy), KPRSSSS(R), TGTA(HB Road), TTA (HB Road), AHSTA (Assam).

In the plenary session on 12th January 2006, Com. Vijeyender Sharma of DUTA welcomed the delegates and speakers. Prof. Prabhat Patnaik, Prof. J.B.C. Tilak, Prof. Arjun Dev and Prof. Anil Sadagopan spoke on education. Com. Sitaram Yechury, Member of Parliament, gave keynote address.

Parallel sessions were held to discuss school education and higher education separately on 12th afternoon and 13th morning January 2006.

On 13th January, in the plenary session, reports of the discussions on both the commissions were presented. Com. Vijayender Sharma presented the declaration with 15-point agenda of action for consideration of central and state governments and of the people at large. Com. Nilotpal Basu, Member of Parliament, addressed the delegates.Com. Sitaram Yechury, Member of Parliament, gave concluding speech.

National Commission on Education :

All India convention on education demands that a national commission of education must be constituted to review the entire system of education.

Coordination Committee on education :

In the convention, a coordination committee was formed with 20 members, 4 from each of the organisations out of which one must be a lady member. Com. Kartick Mandal, President, Com. K. Rajendran, General Secretary, Com. Subhas Chandra Bose, Treasurer, Com. M. Samyuktha are the coordination committee members of our organisation.

Request:

All the constituent organisations were requested to send addresses of their state office, general council members with full particulars, phone number, fax number and E-mail (if any), for any future correspondence in my first circular dated 20.12.2005. General Secretaries of ABPTA, KSTA, APUTF, TNPTF, TGTA, (H.B Road), TTA(H.B Road), KRPSSSS (R), AHSTA are kindly requested to respond.

K. Rajendran
General Secretary, STFI

DECLARATION OF THE CONVENTION ON EDUCATION AT NEW DELHI

In order to ensure quantitative, qualitative and inclusive development of education at all levels in accordance with the demands of emerging realities and to ensure the strengthening of secular, democratic, equitable and scientific ethos in the education system, this All India Convention on Education demands that a national commission on education must be constituted to review the entire system of education and proposes the following 15-point agenda of action for the consideration of Central and State Governments and of the people at large.

1. Universalize and ensure implementation of Right to Early Child Care and Education. Upgrade existing anganwadis and set up similar structures wherever they do not exist. Link anganwadis with school system. Ensure free and compulsory education up to 14 years.
2. Strive for common school system. Ensure at least one state funded school within one-kilometer radius, with mother tongue as medium of instruction. Only recognized school should be allowed. Recognition should be granted on the basis of constitutional principles of secularism, democracy and scientific temper. Keeping these principles in view, Right to Education Bill 2005 should be amended.
3. Education cess should be spent full on state funded school education. Spend at least of 6% of the GDP on education.
4. Integrate vocational proficiency and practical skills within the curriculum so as to develop work culture and employability.
5. No self-financing courses in state funded higher educational institutions. More state funded institutions with adequate infrastructure with ilberal free ships and scholarships. Introduce courses in new and emerging areas in state funded institutions. Expand state funded technical and professional education. Provided adequate funds for research respond to social needs and to defend independent and critical thinking.

6. No foreign direct investment in education.
7. Enact central/state law to regulate fees, admission with reservations, curriculum, infrastructure facilities, and salary and service conditions of staff of all unaided institutions including minority unaided institutions.
8. Autonomous status should not be imposed on colleges.
9. No Private universities. Existing private universities should seek affiliation as colleges. Scrap the deemed university status granted to private institutions. Bring back the earlier criteria for granting deemed university status. Scrutinize all the deemed universities started in the last 4-5 years on the basis of earlier criteria.
10. No privatization and commercialization of education. Education should not be brought under GATS. Initial offers made by the Government of India should be withdrawn.
11. Appoint regular teachers and non-teaching staff. Abolish contract system.
12. No differential fee structure and no hike in fees in state funded institutions. Ensure quality through greater state funding. Decrease the rate of interest on bank loans and provided bank loans without collateral.
13. Democratise the entire system of education. Elections should be held for student unions, teachers' and non-teaching staff associations. Ensure elected representation of students, teaching and non-teaching staff in decision-making bodies.
14. Funding should not be linked to assessment and accreditation. Assessment should be transparent, democratic and participatory. It should be conducted state-wise by state agencies.
15. Strengthen academic relevance of higher education in accordance with the goals of national development.

Share Knowledge, Share Development
Ensure sustainable development through quality education for all

All India Convention On Education

12-13 January 2006 ● New Delhi

Approach Paper

The education sector saw a sustained attack during the six year rule of the BJP. The neo-liberal economic policies pursued by the government saw the denial of access to education to the vast majority of the people. On the other hand communal venom was injected in the content of education of suit their communal and fundamentalist world view. They tried to suppress reason, rationality and questioning and instead tried to establish a society, which is irrational, dictatorial and authoritarian. In this context it is important to realize that the change in the

government at the centre was possible only due to the consistent struggles waged by us and other like-minded organisations. The hollowness of the claim 'India Shining' was exposed comparing with the overall deprivation that had crept in the lives of the common people. Thus the ouster of the BJP from the government is a favourable development to our country.

But we should not harbour any illusions that the UPA government will reverse the current trends. We should remember that it was the Congress government that had initiated the neo-liberal economic policies and the steady withdrawal of the state from welfare activities.Thus the genesis for the privatisation and commercialisation of education can be traced to the period when there was an abdication of responsibility by the state through the structural adjustment programme. However, there also exist opportunities to combat these trends. Today the combined strength of the Left MP's has made the UPA government depend on the democratic movements for its survival. We should therefore use this strength to ensure that the government is forced to bring about certain people-oriented changes in the system of education. Policies and legislations framed by the UPA government need to be examined and alternatives suggested. Further we also need to set a positive long-term agenda for change.

This convention is being held with the aim to arrive at a common perspective on what changes are needed. It will also focus on how the organisations of the students, youth, university, college and school teachers, and people's science movements will respond to these challenges. This approach paper introduces some of the important issues on which this convention should concentrate and develop a common understanding within the democratic movement.

School Education

The promise of the free and compulsory education to every child from 0-14 years remains unfulfilled even after five decades of independence. Over three crore children in the age group of 6-14 years are yet to be enrolled in schools. Amongst those who are enrolled, 7 crores are pushed out of school even before the completion of Class VIII. Most of these belong to the families of marginalised and downtroden people. They are the children of adivasis, dalits, minorities, poor peasants, workers and other such sections. Seventy per cent of those who are yet to be enrolled are girls. These sections face discrimination in school by the dominant sections and require the creation of an appropriate environment and protection in schools to complete their education. Most of the students have access to education through schools that are ill equipped in infrastructure, teacher quality, textbooks, and other supporting mechanisms resulting in high rate of drop outs amongst the children of marginalised sections. Further with the trend towards privatisation and commercialisation of school systems, attendance in government schools is increasingly getting restricted to the children who come from marginalised and poor sections of the society. As a result of this there is a loosening of the systems of social control and the dominant vociferous groups are showing little or no interest in the improvement of quality of education and infrastructure in government schools.

In order to complete the task of the universalisation of school education, the state must take the main responsibility towards the expansion of educational infrastructure and the improvement of quality of education. The task must not suffer because of the lack of funds. The CMP of the UPA is committed to spending 6% of the GDP for education, so it is the duty of the UPA government to re-prioritize its plan allocations to ensure sufficient funds for education. In a developing country like India, though it is possible to involve the private sector in the provisioning of education. But this effort will have to discard its profit motive and be guided by appropriate government regulations and a strict system of social control overseeing the management of schools and the quality of education.

The democratic movement has been demanding that the state provide a school in every habitat, which provides free and compulsory education to all children in the neighbourhood. It has also been struggling to ensure that students are enrolled into schools without any discrimination and that they are provided facilities like mid-day meals, textbooks, uniforms, free-ships etc. It has been supportive of the Kothari Commission recommendation of transforming the school system to meet the requirements of a common school system.

In this context we will have to examine the present policies and programmes of the present government on school education. We are aware that the government is proposing a Right to Education Bill, 2005 in order to meet its obligations under the 86th constitutional amendment. However this bill has some serious lacunae that we have to consider. First, how should we include pre-school education for the children of the 0-6 age group? Second, the question of whether or not the Bill is an advance towards the establishment of a common school system is to be discussed. Third, what should be conditions attached and grounds on which state aid should be provided to the private schools to realize the aim of unversalisation of education? Fourth, there are questions regarding whether the teacher should be an employee of the school without an opportunity for mobility or the member of state cadre. Fifth, the issue of what type of social monitoring and control, and regualtion should be adopted to ensure the goals of universalisation of school education and democratization of management of schools. The lacunae in the bill will have to be plugged to ensure that the proposed Act is consistent with the goals of the democratic movement.

Five of the seven committees set up by the CABE deal with the problems of school education. Their recommendations need to be examined at the convention from the stand point of the democratic movements. In response the demand for the detoxification of curricula, syllabi, textbooks etc., the NCERT was authorized to revise he National Curriculum Framework (NCF), 2000. Though the NCF has already been adopted by the CABE it has raised some pertinent issues that need to be discussed. First, will it really be able to ensure the detoxification of education or not? Second, issues have also been raised with regard to the overall politics of the document, its inconsistencies and its lack of clarify on the goals and philosophy of education. In this context its specific social constructivist approach to teaching-

learning methods also needs to be discussed from the stand point of meeting the needs of critical pedagogy. Third, it needs to be seen whether the treatment imparted by the document to local knowledge is appropriated or needs revision. Fourth, whether the approach it takes towards the system of examinations, teachers training, text books writing etc., would be able to advance the goals of universalisation of school education in a country like India. Deliberations in this convention should focus on the resolution of the differences that exist within the democratic movement on the NCF.

The on-going Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) started by the NDA government has provided space to the communal forces to spread their network within the country. The UPA government needs to be forced to review this programme and ensure that in no circumstances any future government would be able to use education to undermine the inclusive spirit of the Indian Constitution. Deliberations at the convention should come out with suggestions and strategies to ensure this.

On Higher and Professional Education

Since the National Policy on Education was adopted in 1986, the general and professional higher education has witnessed several structural changes. During the decade of nineties, known as the start of the era of globalisation, liberalisation and privatisation, the general and professional higher education suffered a lot. The NDA government took hard steps towards privatisation and commercialisation of education and as a result general and professional higher education sector has been facing tremendous difficulties and challenges. Some of the issues are listed below :

S.No.	Issue	Position	Demand
1.	Reduction of State	Oppose it	Expenditure of higher education should be : 1. At least 6 percent of the GDP and 2. 10 percent of the central budget.
2.	Principle of quality,	Insist on it	More State funded institutions with adequate quantity and equity infrastructure with liberal freeships and scholarships.
3.	FDI in Education	Oppose it	No to the entry of FDI in education, because 1. It is unwarranted since it would impede the development of indigenous and critical research within our university education system, and 2. Aggravate the tendency towards commercializaton and strengthen the stranglehold of neo-liberal ideas in the academia.

4.	Self-financing institutions and courses	Retrograde in the field of higher education	1. No self-financing course should be in emerging areas like genetic engineering, etc. 2. Certain norms of accountability should be there. 3. No to transfer of general courses in self-financing sector. 4. The fee gap between two types of courses should be reduced and government grants should come. In due course of time these courses should become like others. 5. There should be social control on fees, admissions with reservations, curriculum, infrastructural facilities and salary and service conditions of staff.
5.	Private unaided Professional courses institutions	There should be social control	1. Central law, which enable State governments to have social control, should be enacted without transfering education from concurrent list to central list. 2. For this purpose, the Constitution has already been amended. 3. The Government should take steps to identify minorities statewise. 4. There should be social control on fees, admission with reservations, curriculum, infrastructural facilities and salary and service conditions of staff.
6.	Autonomous college scheme	Oppose it	Stop forcing college to become autonomous. 1. First they use the public money and build infrastructure. 2. Then they become autonomous in order to sell courses and privatize education.
7.	Private universities	Oppose it	Present private universities in some States be converted back to their original status.

8.	Deemed university	No deemed university in private sector	1. Scrap the deemed university status from private institutions. 2. Bring back the old criteria for granting deemed university status. 3. Scrutinise all the deemed universities started in last 4-5 years on the basis of old criteria.
9.	Foreign universities	Oppose foreign universities	1. No foreign university should be allowed to be established. 2. There could be specific collaboration between foreign universities and Indian unversities as is already happening under mutual exchange programmes. 3. No offshore campus should be allowed.
10.	Education under GATS	Oppose it	Education should not be brought under GATS, because it will lead to : 1. Privatisation and commercialisation of education, and 2. Endanger the existence of State funded institutions.
11	Privatisation and Commercialisation	Oppose it	1. Privatisation and commercialisation must stop. 2. We should remain vigilant against all moves of the Government for this purpose. 3. No privatisation of any academic and non-academic activity in the institutions. 4. End the contract system for perennial work which is already in place in non-academi activities.
12	Fee and Annual Charges	Oppose any hike in fee and annual charges	1. Total annual charges should be treated as fees. 2. No differential fee structure. 3. No user charges for any facility.
13	NAAC	Not opposed to assessment per se	1. Funding cannot be linked with assessment. 2. Assessment should be transparent, democratic and participative. 3. No private agency for assessment.

14	Recruitment	Oppose ban on recruitment	1. Remove the ban on appointments in C and D category and cut in teaching and non-teaching positions. 2. Appoint regular teachers and non-teaching staff instead of appointing them on contract.
15	Student Loans (Government) and Bank Loans	No financing of students directly through student loans	1. Stop proposed replacement of public institutional financing by student's loan. 2. This means withdrawal from State funding of institutions and enhancement of fees. 3. Statutory duty of financing higher education is being converted into contribution to financing through students loan scheme. 4. Strengthen bank loans by decreasing the rate of interest and without any collateral.
16	Education Cess	Should continue	1. It should be spent on Sarva Shiksha Abhiyan. 2. The promise of separate fund on higher education should be fulfilled.
17	Financial incentives for generating funds through consultancy etc.	Oppose the recent proposal of 60% of the income to teachers who were involved in consultancy	Existing provisions should be maintained.

From
Prof. Ranju Gopal Mukhopadhyay
Chairman, School Education Committee,
West Bengal (2001-2003)

To
The Editor,
Shiksha O Sahitya,
Teachers' Journal,
All Bengal Teachers' Association,
P-14, Ganesh Chandra Avenue,
Kolkata - 700 013.

Dear Sir,

It pains me to draw your attention to the following sentences of the article 'Adolescence and Sex Education' written by Sri Kanailal De and published in your esteemed journal (Vol. LXXXIV, No.9, September 2005) :

"Sex Education from class VI and Live Together from class VIII–a novel idea formulated by Ranjugopal Mukherjee is ultimately nullified by the West Bengal Board of Secondary Education as it is not suitable to the tender boys and girls. Jiban Sailee, the other name of sex education, is the brain child of some traders of birth control pill as per report of the conference held at Thailand in 2004."

Reading these lines in your journal was a shocking experience for me. I have never personally thrown any 'novel idea', nor coined any nomenclature as attributed to me by your learned author, an Ex-Head Master of a school. Hence there can be no question of WBBSE 'nullifying' that. Whatever has been formulated in this area is contained in the two volumes of report of the West Bengal School Education Committee (2001-2003) of which I was the Chairman. The Committee's recommendations in this respect relate to a holistic scheme of life-skills education for the adolescent boys and girls under the novel, but appropriate, title 'Life Style Education'. The Government of West Bengal has accepted the recommendation and the WBBSE and the West Bengal Board of Madrasah Education are implementing the course. The objective of this component in Secondary Education is to help the young boys and girls cope with various physical, mental and moral problems that torment them during this stormy stage of life. There is pronounced emphasis in the scheme on developing the essential life skills and strengthening the value-systems of the students, so that they can lead healthy personal, familial and social life.

I, therefore, find these beseless sentences damaging and defamatory. You may remember that I drew your attention to this slanderous part in your publication. Of

course, you were prompt and gracious enough to apologise for your inadvertance in editing. I also contacted the author of the piece over the phone, talked about the matter, and requested him to kindly make it convenient to come over to Kolkata and meet me at SCERT which incidentally was the office of the School Education Committee (2001-2003). He pleaded his inability to undertake this journey on ground of ill health. But in that conversation itself it transpired that this gentleman had never gone through the Committee's report or any other official document in this respect. He tried to defend himself by saying that he had got this piece of 'Information' from a bulletin published by some other teachers' organisation. However, in the end he tendered apology for 'mistake, if any.' I further requested him to send his explanation in writing. I waited these two months in vain and am now approaching you for favor of publishing the full text of this rejoinder in the next issue of your journal.

One can excuse ignorance, but not its arrogant expression in print. Had I come across such libellous statements anywhere else, I would have thought of taking stern action. In your case, I can only expect more careful editing in order to protect and preserve the image of your journal and, of course, your prestigious Association too.

Yours faithfully,
Ranju Gopal Mukhopadhyay
19.12.05

The Reorientation Programme on Communicative Approach in Asansol Sub-Division

The main focus of every educational enterprise is the development of the Child.

In the sphere of English Language teaching the principal objective is to facilitate a child's maximal learning in the classroom situation. As the teachers are the main catalytic agents on the path of modification of behaviour in terms of learning, they have to meet together time and again for enrichment, exchange of views and enlargement of outlook as well as creating new awareness.

In fact, as facilitator, the teachers play the key role in an educational process as the real corner stone of a teaching-learning situation.

Although the teachers of related subjects are efficient enough and in course of their everyday experience they enrich their expertise, teaching-learning situation never remains static. Its mobility is so fast that it is always in a flux. Whenever there are changes in the Syllabus, change in approach, or methodology, the teachers need to be aware of them because they implement all the systems in the classroom for the betterment of the students. So "making" and "remaking" is a continuous process.

Inspired and guided by Asansol Sub-Divisional ABTA, six one day reorientation camps were organised in Raniganj, Jamuria, Burnpur, Kulti, Barabani and Asansol Zone.

The camps had its first session in Raniganj High (+2) School on 6 August 2005. While inaugurating Sri Kartick Mondal the Headmaster, introduced the Resource Persons and narrated the purpose of holding such camps.

An eminent educationist and academician, Sri Sukhendu Bikash Ghatak, the Ex-Headmaster of Subhas Pally Vidyaniketan, enchanged the grace and gravity of the programme. He told that during last twenty years English as a language for communication has emerged as the most demanded language and so the teachers must be aware of the changes in technique for teaching.

Sri Sumay Roy, the Key Resource Person of WB Board of Secondary Education discussed in detail the philosophy of the New Approach. He elaborately narrated the Functional Communicative Methodology, which was a sustained and sincere work.

Then Dipak Sarkar narrated the 4 skills and showed the difference between the content-based subjects and a skill-based subject.

After a short break there were practical demonstration for classes VI, VII, VIII. Sri Sumay Roy made an sincere effort to make the children speak a few sentences in English, in course of conversation. The demonstration class on Aural-Oral was really living. Then Dipak Sarkar gave a demonstration of writing by taking a class of the students of class VII. Students responded after initial hesitation and the class became joyful through participation.

The next programme was held on 8 August in Jamuria Girls' High School, where the task was a bit challenging because of the low exposure of the students in the target language.

All the 'ifs' and 'buts' of the participants' mind were removed by Sri Kanai Lal Ghosh's words which inspired the teachers to integrate all the elements efficiently according the practical need. So the Resource Persons had to use Hindi words from time to time to facilitate the comprehension of the students. There were

three demonstrations for the lower classes. Sri Gautam Kabi and the Headmistress of the School offered full fledged co-operation to make the programme a success. The students showed a lot of enthusiasm and zeal as they found interest in the subject and were able to cross the obstacle of their mother tongue, to some extent, although the process was a bit slow.

The most interactive and in the true sense communicative programme took place in Burnpur Subhas Pally Vidyaniketan on 9 Aug. where Sri Baidynath Mukherjee had a key role to play.

He inaugurated the meet with the valuable words that teaching/learning is a never ending process of experiment. One should not teach in pick and choose way or in a random way. The teachers' enthusiasm was remarkable and there existed a homely environment in the room for discussion and all the suggestions. The demonstration classes were taken by Sri Debashis Banerjee and Sri Dipak Sarkar, for the students of VI/VII and VIII. The students responded nicely and in a jovial mood.

Orientation camp in Kulti Zone held on 10 Aug. in Kulti Girls' H.S. School was equally interesting. Sri Shanti Bhattacharya an eminent educationist inaugurated the meet and narrated the basic purpose and objective of arranging such programmes for the teachers.

He told all the participants that teaching is a pleasant profession if one can bring it out from routine bound life and monotony. With varied activities one has to be skillful while teaching skill to the students.

The area was greatly cosmopolitan and all the schools do not have the same problem because the entry levels of the students are different. Alot of complexities were clarified during the discussion in which the teachers participated by asking questions.

Demonstration classes were taken even for the class V students who were happy to open their mouth with English words and small sentences.

They had a realization that one can speak small sentences if one tries with the help of the teachers. The reading comprehension lesson for class VIII by Debashish Banerjee was really enjoyable.

The reorientation camp in Kanyapur H.S. under Barabani Zone was held on 12 Aug. under the leadership and guidance of Sri Pradip Mondal with the co-operation of Sri Joydev Biswas the Headmaster.

The participants included teachers from Chittaranjan Zone also. After a brief discussion about purpose of second language learning, nature of second language learning and meaning of skill, in the second half there were demonstration classes on writing and reading comprehensions. The art and science of writing was discussed by the Resource Persons.

In the Asansol Zone, the camp was held in DAV High (+2) School on 16 Aug. where Sri Monoj Das, secretary, Asansol Zone, ABTA explained in detail the objective of the meet. M.M. Bazlur Rahman the president, Asansol Zone, ABTA, also clarified some points regarding organising such workshops.

A one day camp cannot convey all the basic features and tenets of communicative approach which being very practical and pragmatic is related to real life situation. But the six day programme made the new generation teachers aware to some extent. The inter-faces among the teachers were immensely effective and enhanced not only familiarity but also cordiality among them. More over, it sharpened the appetite of the Resource Persons as well as the teaching personnel to know more and do something positive and purposeful for the future.

GOVT. CIRCULAR

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
School Education Department
(Secondary Branch)
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-91

No : 1337-SE(S)/5P-117/2005 the 31st October, 2005

From : Shri A. Chatterjee
Asstt. Secretary to the Govt. of West Bengal

To : The Director of School Education, West Bengal

Sub : Fixation of scale of pay of SRI SWADESH RANJAN BHATTACHARYA, Asstt. Teacher, Baxarah High School, P.O. Baxarah, Dist. Howrah.

The undersigned is directed to refer to his Memo No. 963-GA/4G-1100/82 dated 20.4.05 on the above noted subject and to say that Pay Fixation of SRI SWADESH RANJAN BHATTACHARYA who has been appointed as Asstt. Teacher of Baxarah High School, Howrah through W.B.S.S.C. after tendering resignation from the post of Librarian of Ghoshpur Union Netaji Vidyapith, Vill. & Post. Ghoshpur, Hooghly would be made in terms of Para 7 of Govt. Order No. 492(6)-Edn(B) dated 26.10.81.

Sd/- A. Chatterjee
Assistant Secretary

Memo No. 2854/431-GA Dated Kolkata, the 7.12.2005
4G-1100/82

Copy forwarded for information and necessary action to :-

(1) The District Inspector of Schools (S.E.), Howrah, 18, Nityadhan Mukherjee (3rd floor), Howrah-1.
(2) The Secretary, Baxarah High School, P.O. Baxarah, Dist. Howrah.
(3) SRI SWADESH RANJAN BHATTACHARYA, Asstt. Teacher, Baxarah High School, P.O. Baxarah, Dist. Howrah.

Sd/-Illegible
for Commissioner of School Education
West Bengal

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

রাজ্য শাখা পরিচালিত

হলিডে হোম

বক্রেশ্বর

সত্যপ্রিয় রায় স্মৃতি বিশ্রাম ভবন-এর ভাড়া

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন		জামানত	ঘরের সংখ্যা
	সদস্য	সদস্য নয়		
৪	৭৫·০০	১০০·০০	১০০·০০	৮

দীঘা

রথীন্দ্রকৃষ্ণ বিরাম নিলয়-এর ভাড়া

	শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন		জামানত	ঘরের সংখ্যা
		সদস্য	সদস্য নয়		
কুটির	৬	১০০·০০	২০০·০০	২০০·০০	৮

	শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন	জামানত	ঘরের সংখ্যা
ডরমেটারী ঘর	২	৫০·০০	৫০·০০	১
	৩	৭০·০০	৭০·০০	১
	৪	৯০·০০	৯০·০০	২
	৬	১৩০·০০	১৩০·০০	২

	শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন	জামানত	ঘরের সংখ্যা
ডরমেটারী হল	২০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	১
	২৮	শয্যাপ্রতি ২০·০০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	১

হলিডে হোম বুকিং করতে অবশ্যই সমিতির স্কুল/মহকুমা বা জেলা শাখার কর্তৃপক্ষের পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে। এছাড়া সমিতির সদস্য ব্যতীত ব্যক্তি নিজ নিজ অফিস কর্তৃপক্ষের পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে।

জামানত ঃ ভ্রমণশেষে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে তা বাদ দিয়ে এবং দীঘা হলিডে হোমের কুটির ভাড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খরচের টাকা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ফেরৎ পাওয়া যাবে।

ডরমেটারী হল/ঘর ব্যবহারকারীগণ, প্রয়োজনে রান্নার জায়গা ব্যবহার করলে প্রতিদিন ৬০ টাকা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত দিতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ

কলকাতা-৭০০ ০১৩

দূরভাষ ঃ ২২১৫-৮৮৫৬, ২২১৫-৯১৫৮

Regd. No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP-225/2004-0(

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

Printed by Sibaprasad Mukherjee at the Ganashakti Printers (P) Ltd. 33, Alimuddin Street, Kolkata-700 016 and also Published by him at the A.B.T.A. Office, P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700 013.